[আমাদের ছুটি – ৪৪শ সংখ্যা]

বিশ্ববিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ - আলোকচিত্রী সঞ্চারী দাশগুপ্ত

আমাদের ছুটি – ৪৪শ সংখ্যা

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
ভাদ্র - চৈত্র ১৪৩০

দীর্ঘ সৈকত জুড়ে অজস্র মানুষের মেলা... স্নান করছেন, পুজো করছেন ভিজে বালিতে বসে ধূপধুনো সহযোগে, স্নানশেষে পোষাক বদলে ভেজা কাপড় মেলে হাওয়ায় শুকিয়ে নিচ্ছেন দু-চারজনে মিলে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে সাধু-সন্ন্যাসীরা ঘুরছেন দুটো পয়সার আশায়, ফোটোগ্রাফার ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর বাক্সওলা ঠেলাগাড়ি নিয়ে, বাছুর আর পুজোর সরঞ্জাম নিয়ে ভক্তকে গরুদানের পুণ্যার্জন নাকি আগেভাগেই বৈতরণী পেরিয়ে থাকার সুযোগ করে দিতে বেরিয়েছে কয়েকটা দল। হোগলার চালা অপ্রতুল, গুটিকতক মোবাইল টয়লেট-এ লম্বা লাইন। নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাউন্টার, ভান্ডারা। এল-ই-ডি আলোতে ঝলমলে মন্দির, পিচঢালা রাস্তার এদিকে ওদিকে প্রিভিলেজডদের রাত্রিবাসের নানান আয়োজন। হিমেল রাতে পথের ধারে প্লাস্টিক শিট আর কম্বলমুড়ি দিয়ে খোলা আকাশের নিচে নিদ্রিত কাতারে কাতারে মানুষ। জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবাইকে লঞ্চে-বার্জে নদীর মোহনা এপার-ওপার করিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর জন্য সদাজাগ্রত প্রশাসনিক তৎপরতা। গঙ্গাসাগর। একবারই। ঈশ্বর নয়, প্রকৃত ভারতবর্ষের সন্ধানে গিয়েছিলাম সেখানে।

আমাদের ছুটি-র এই সংখ্যাটি প্রকাশে বিস্তর বিলম্ব হল নানা কারণে। সম্পাদনা বিভাগের তরফে আমরা লেখক-পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

বসন্ত রঙিন হয়ে উঠুক সকলের, শুভ হোক নববর্ষ।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ এই সংখ্যায় ~

বানিহাল থেকে যদি কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য দেখে থাকেন, তবে আপনার জীবনে তা একটা অমূল্য সঞ্চয়। ফিয়োসোল থেকে ফ্লোরেন্সের দৃশ্য নাকি মনোরম। তেমনই মনোরম মিস্ত্রার ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে স্পার্টা নগরী দর্শন। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য আরো মনোরম ও মনোহর। তফাৎ শুধু এইটুকুঃ এখানে গম্বুজ নেই, মিনার নেই অথবা আকাশ-স্পর্শী শিখর নেই।

- রাজিয়া সেরাজুদ্দিনের কলমে "ভূস্বর্গ কাশ্মীর"

আমাদের ছুটি – ৪৪শ সংখ্যা

~ আরশিনগর ~

রেল নিয়ে আলোচনায় – তপন পাল

~ সব পেয়েছির দেশ ~

চেনা পুরীর অচেনা ঠিকানায় – দময়ন্তী দাশগুপ্ত

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক (শেষ পর্ব) – মৃণাল মণ্ডল

~ ভুবনডাঙা ~

বৈচিত্র্যময় সিসিলিতে – শ্রাবণী ব্যানার্জী

ল্যুরে ক্যাভার্নস – দীপান্বিতা গঙ্গোপাধ্যায়

সফর কেমব্রিজ – সঞ্চারী দাশগুপ্ত

~ শেষ পাতা ~

বেথুয়াডহরিতে একদিন – পথিক

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2024 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

আমাদের ছুটি – ৪৪শ সংখ্যা

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪৩০

দীর্ঘ সৈকত জুড়ে অজস্র মানুষের মেলা... স্নান করছেন, পুজো করছেন ভিজে বালিতে বসে ধূপধুনো সহযোগে, স্নানশেষে পোষাক বদলে ভেজা কাপড় মেলে হাওয়ায় শুকিয়ে নিচ্ছেন দু-চারজনে মিলে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে সাধু-সন্ন্যাসীরা ঘুরছেন দুটো পয়সার আশায়, ফোটোগ্রাফার ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর বাক্সওলা ঠেলাগাড়ি নিয়ে, বাছুর আর পুজোর সরঞ্জাম নিয়ে ভক্তকে গরুদানের পুণ্যার্জন নাকি আগেভাগেই বৈতরণী পেরিয়ে থাকার সুযোগ করে দিতে বেরিয়েছে কয়েকটা দল। হোগলার চালা অপ্রতুল, গুটিকতক মোবাইল টয়লেট-এ লম্বা লাইন। নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাউন্টার, ভান্ডারা। এল-ই-ডি আলোতে ঝলমলে মন্দির, পিচঢালা রাস্তার এদিকে ওদিকে প্রিভিলেজডদের রাত্রিবাসের নানান আয়োজন। হিমেল রাতে পথের ধারে প্লাস্টিক শিট আর কম্বলমুড়ি দিয়ে খোলা আকাশের নিচে নিদ্রিত কাতারে কাতারে মানুষ। জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবাইকে লঞ্চে-বার্জে নদীর মোহনা এপার-ওপার করিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর জন্য সদাজাগ্রত প্রশাসনিক তৎপরতা। গঙ্গাসাগর। একবারই। ঈশ্বর নয়, প্রকৃত ভারতবর্ষের সন্ধানে গিয়েছিলাম সেখানে।

আমাদের ছুটি-র এই সংখ্যাটি প্রকাশে বিস্তর বিলম্ব হল নানা কারণে। সম্পাদনা বিভাগের তরফে আমরা লেখক-পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

বসন্ত রঙিন হয়ে উঠুক সকলের, শুভ হোক নববর্ষ।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ এই সংখ্যায় ~

বানিহাল থেকে যদি কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য দেখে থাকেন, তবে আপনার জীবনে তা একটা অমূল্য সঞ্চয়। ফিয়োসোল থেকে ফ্লোরেন্সের দৃশ্য নাকি মনোরম। তেমনই মনোরম মিস্ত্রার ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে স্পার্টা নগরী দর্শন। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য আরো মনোরম ও মনোহর। তফাৎ শুধু এইটুকুঃ এখানে গম্বুজ নেই, মিনার নেই অথবা আকাশ-স্পর্শী শিখর নেই।

- রাজিয়া সেরাজুদ্দিনের কলমে "ভূস্বর্গ কাশ্মীর"

আমাদের ছুটি – ৪৪শ সংখ্যা

~ আরশিনগর ~

রেল নিয়ে আলোচনায় – তপন পাল

~ সব পেয়েছির দেশ ~

চেনা পুরীর অচেনা ঠিকানায় – দময়ন্তী দাশগুপ্ত

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক (শেষ পর্ব) – মৃণাল মণ্ডল

~ ভুবনডাঙা ~

বৈচিত্র্যময় সিসিলিতে – শ্রাবণী ব্যানার্জী

ল্যুরে ক্যাভার্নস – দীপান্বিতা গঙ্গোপাধ্যায়

সফর কেমব্রিজ – সঞ্চারী দাশগুপ্ত

~ শেষ পাতা ~

বেথুয়াডহরিতে একদিন – পথিক

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2024 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ – তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

[রাজিয়া সেরাজুদ্দিনের পরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে তিনি একজন শিক্ষিত সংবেদনশীল বাঙালি মহিলা। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে (১৯০৪ খ্রি.) বেগম রোকেয়ার 'কূপমণ্ডুকের হিমালয়দর্শন' বাঙালি মুসলমান মহিলার লেখা প্রথম ভ্রমণকাহিনি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই ভ্রমণকাহিনিটিই সম্ভবত দ্বিতীয়।
মূল লেখাটি 'সওগাত' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

রাজিয়া সেরাজুদ্দিন

যাঁরা কাশ্মীর যান নি তাঁদের উপর দয়া করা উচিত। সুমেরু অঞ্চলে অভিযানের জন্য একজনের পর্যটক হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে, কিন্তু কাশ্মীর যদি সে না গিয়ে থাকে, তাহলে আমি বলব, সে বিখ্যাত পর্যটক নয়। হংকং-এর পুরাতন আসবাব সামগ্রী, টাঙ্গানিকার বাঘের চামড়া আপনার বাড়ীতে থাক, কিন্তু যদি কাশ্মীর না যান তবে আমি বলব, ভ্রমণের সুরুচি আপনার নেই।
বানিহাল থেকে যদি কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য দেখে থাকেন, তবে আপনার জীবনে তা একটা অমূল্য সঞ্চয়। ফিয়োসোল থেকে ফ্লোরেন্সের দৃশ্য নাকি মনোরম। তেমনই মনোরম মিস্ত্রার ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে স্পার্টা নগরী দর্শন। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য আরো মনোরম ও মনোহর। তফাৎ শুধু এইটুকুঃ এখানে গম্বুজ নেই, মিনার নেই অথবা আকাশ-স্পর্শী শিখর নেই।
শ্রীনগর পৌঁছবার আগে যেদিকে খুশী তাকান দেখবেন, আপনার সম্মুখে বন্ধ্যা সুদীর্ঘ দেবদারু তরুর সারি আর মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। ক্ষেতে কাজ চলছে। পাশে সরু খাল - সারা বছর পানীতে ভরা থাকে, তার উপর পীত রঙের ফুলের জোয়ার।
দেবদারু-ঢাকা সড়কের উপর দিয়ে চলার সময় চোখে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম। চারিদিকে ধোঁয়া উঠছে। তারই ভেতর দিয়ে গায়ের আবছা আভাস। দেখে মনে হবে, সব কিছু পুড়ে গেছে, এইগুলো শুধু অবশিষ্ট ছাই। পৃথিবীর বুকের উপর যেন অসংখ্য ব্যাঙের ছাতা। তারই ভেতর মানুষ বাস করে। শুধু বাস নয়, তাদের সমস্ত জীবন এইখানে কাটে। এই নোংরা বস্তী দেখে সমাজের অন্যায় আর অবিচারের কথা সহজেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।
কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনে কাশ্মীর হতাশা সৃষ্টি করে। হ্রদের পাশে, জলভূমির পাশে ডিঙির উপর ঘরগুলো আদৌ মনোরম নয়। বিখ্যাত 'মিরান কাদাল' একটা সাধারণ বাজার ছাড়া আর কী! কিন্তু কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য এত বিভিন্ন প্রকৃতির, যে ধীরে ধীরে তার আস্বাদ পাওয়া যায়। তখন হতাশার স্থান অধিকার করে আনন্দ।
কাশ্মীর সহরের কোলাহল ছেড়ে যদি ডাল হ্রদের তীরে পৌঁছান আপনার চোখে পড়বে, সুন্দর সুন্দর 'হাউজ-বোট" পানীর উপর ভাসছে। বাতাসের সাথে খেলা করে তাদের রঙ্গীন পর্দা আর চাঁদোয়া।
সিন্ধু উপত্যকার উপর দিয়ে মোটরে চড়ে যান অথবা ফ্রেসলন থেকে পাহল গাঁ পর্য্যন্ত যদি পায়ে হেঁটেই বেড়ান –দৃশ্যের কোন পরিবর্তন নেইঃ দেবদারু গাছের সারি, ধানের ক্ষেতে আর তার তার বুক জুড়ে সরু দাগের মতো ছোট ছোট খাল। কক্ষ পাহাড়তলীর পথ দিয়ে চলতেও এই দৃশ্যই চোখে পড়ে।
জুলাই বা আগষ্ট মাসে যদি গরম বোধ করেন অথবা ভাপসা আবহাওয়া আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে গুলমার্গে একটী কুটীর ভাড়া নিতে ভুলবেন না। ভাল কাঠের তৈরী এই সব কুটীর দেখলে মনে হয় যেন হ্যান্স এ্যান্ডারসনের রূপকথার দেশে এসেছি। ইঁট-পাথরের কোন বালাই নেই এখানে। জঙ্গলের মৃত তরুদের হাড় যেন চারিদিকে ছড়ানো ।
যাঁরা খুব ফুল ভালবাসেন, তারা যেন দয়া করে 'ফিরোজপুর নালা" ধরে গুলমার্গ থেকে টানমার্গ পর্য্যন্ত একবার পায়ে হেঁটে যান।

আপনার মনে হবে যেন একটী প্রাকৃতিক উদ্যানের ভেতরে এসে পৌঁছলেন। এই উদ্যানে বিশৃঙ্খলতাই যেন সবচেয়ে বড়ো কথা। পাথরের আড়াল ছেড়ে কত রকমের ফুল না উঁকি মারে। দুপাশে শুধু ফুলের বেড়া। বাঁশ-কঞ্চির বেড়া এ-জগতে কেউ দেখে না।
যদি গল্ফ খেলায় আপনার ঝোঁক না থাকে তা হলে সোজাসুজি পাহল গাঁয়ে গিয়ে আস্তানা পাতবার উপদেশই আমি আপনাকে দিতে চাই। জায়গাটা এখনও মধ্যযুগের ওপারে, এইটুকুই যা অসুবিধা। সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে পাহল গাঁর পার্থক্য শুধু এইখানে। এই জায়গার আবহাওয়া খুব মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর। পানীতে নানা ধাতব উপাদান আছে, বিশেষজ্ঞদের মত। পাহল গাঁ থেকে অমরনাথ তীর্থ দর্শন করতে পারেন। কাশ্মীরে দুটো গ্লেসিয়ার আছে। পাহল গাঁ থেকে যেতে বেশ সোজা। কিন্তু আধুনিক জগতের সব সুবিধা এখানে প্রত্যাশা করবেন না। তাই আগেই বলেছি, কাশ্মীর এখনও মধ্যযুগের ওপারে রয়েছে।
কাশ্মীর শহরের ট্রাফিক আর জনতার কোলাহল ভাল না লাগে, আশা করি আপনি তাহলে (...)* তাঁবু পাতবেন। এখানে রৌদ্র পোহান আরামে। রৌদ্রও সৌরভমাখা। বাদাম গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর আলো-ছায়ার লুকোচুরি দেখে চোখ ভরে যায়। এই পার্কই ছিল একদিন মোগল সম্রাটদের বিশ্রামের মঞ্জিল।

*(*ছাপা অস্পষ্ট ছিল। সম্ভবত 'শালিমার বাগে' হবে।)*

মনসবল, গন্দরবল আর সোনামার্গ বন-ভোজনের মনোরম জায়গা। রবিবারে নিশাতি ও শালিমার উদ্যান আরো দূরে শাহী ও হারওয়ান ঝর্ণা – যে কোন দিকে আপনার উদাস মনের রাশ ঢিল দিতে পারেন। ঐ সব বাগান আর ঝর্ণার ধারে ঘাসের উপর যারা শুয়ে থাকে সেই সব সুন্দর আর সুন্দরীদের দিকে চেয়ে আপনার মনে হবে, আপনি দেশ-ভ্রমণে আসেন নি – আপনি এখানে পড়ছেন ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ যার পাতা এডমন্ড ডুকরের আঁকা নয়, তার চিত্রকর স্বয়ং বিধাতা। নিশাৎবাগ থেকে ডাল হ্রদের সৌন্দর্য্য বেশী খোলতাই হয়। হ্রদের বুকের উপর শিকারা (নৌকাঘর) গুলো ছেলেদের খেলনার মত দেখায়।
কাশ্মীর মোগল আমলে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। এই জন্য কাশ্মীরে সৌন্দর্য্যের এত বিভিন্ন প্রতীক ছড়ানো। মুর-সম্রাটগণ স্পেনে কফি, লিলাক আর গুলাম-আহারের সারি প্রথম আনে। মোগলেরা কাশ্মীরে এনেছে দেবদারু আর চেনারের সারি।
তবু কাশ্মীরে ফেরীওয়ালাদের জ্বালায় অস্থির হোতে হয়। দুপুরের ঘুম বা স্নানের সময় মালী ফুল নিয়ে হাজির। কেউ নিয়ে আসে কুঁড়ি। সব চেয়ে বিপদজনক নাপিত। আপনার চুলের দিকে চেয়েই বাড়ীর মুরুব্বিদের মত মন্তব্য করবে, আপনার চুলকাটা দরকার।
কাম্মীরীদের সৌভাগ্য যে তাদের জন্মভূমিতে বৃষ্টি হয়, বরফ পড়ে। আর সূর্য্যের আলোও খুব প্রখর । বীজাণু-নাশের কাজ প্রকৃতির এই সব দূতেরাই সম্পন্ন করে। সব চেয়ে সুন্দর দেশের অধিবাসীরা এত নোংরামি পছন্দ করে। নোংরা থাকা কাশ্মীরীদের একটা স্বভাবগত অভ্যাস। শুধু সূর্য্যের জন্যই এরা বাঁচে। নচেৎ দু-মাস অন্তর কাশ্মীরে মহামারী দেখা দিত। একবার এক জার্ম্মাণ ডাক্তার কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের উপর পুস্তক রচনার জন্য এ-দেশে আসেন। কিন্তু তাঁর পেশাগত উপজ্ঞা-ইনসটিঙ্কট তাঁকে রেহাই দিল না। কাশ্মীরীদের প্রত্যেকের হাতের চামড়ায় তিনি এক রকম রোগ আবিষ্কার করলেন। শেষে তিনি বই লিখলেন চিকিৎসা-শাস্ত্রে।
কাশ্মীরী অভিজাতদের ব্যবহার আর সংস্কৃতির গুণ সকলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু আমাদের উঁচুতলা আর নীচুতলার অধিবাসীদের মধ্যে এত ফাঁক আর ব্যবধান বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কাশ্মীরের ব্যবসাদারদের শঠতা আর চালাকী প্রায় প্রবাদ বাক্যের সামিল। কাশ্মীরে এলে তার যাথার্থ ভাল করে উপলব্ধি করা যায় –সোজা ভাষায়, হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়। কিন্তু এরা সুদক্ষ কারিগর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চীনেদের মতো কাশ্মীরীদের একটা স্বভাবগত সৌন্দর্য-প্রাণ আছে। কাশ্মীরী শালের কাজ, কা'কে না মুগ্ধ করবে। বুদ্ধি আর বিচক্ষণতায় ত এরা ওস্তাদ। কিন্তু এরা নীতিবিদ নয়। মিথ্যা কথন যেন কাশ্মীরী ভাষার অঙ্গ। কথায় কথায় কিরে কাটা এদের বিশেষ স্বভাব।
কাশ্মীরী মেয়েদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। তাদের ময়লা শরীরের ভেতর দিয়ে রূপ হয়তো ফোটে, মাঝে মাঝে সুন্দরী মেয়েও চোখে পড়ে বৈকি, কিন্তু কাশ্মীরী মেয়েদেরর তনু আঁকা চলে না। মাথার চিত্র আঁকা সম্ভব, কারণ এদের পোষাক অবয়ব সবই ঢাকা থাকে, শিল্পীকে হতাশ হোতে হয়।
কাশ্মীরী মেয়েদের গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করার ভেতর নানারকম ছন্দ ফুটে ওঠে। এটা শিল্পীদের লোভনীয় স্থান। কিন্তু ছবি আঁকবার সরঞ্জাম দেখলেই মেয়েরা পাত্তাড়ি গুটায়।
পয়সার লোভে যারা 'মডেল' হয় তাদের অভিনয় সুলভ ক্ষমতা আছে। কিন্তু মেয়েরা ছবি আঁকার ইজেলকে মনে করে ক্যামেরা – তাই তারা হাতে হাতে ফল প্রার্থনা করে।
তিন মাস কাশ্মীরে হাওয়া বদলের পর অনেকের আর কাশ্মীর হয়ত ভাল লাগে না। তখন কাশ্মীরে নাড়ী নক্ষত্র আপনার জানা।
কাশ্মীর থেকে ফিরে এলেন। সঙ্গে নানা সামগ্রীর কাশ্মীরী শাল, ভাইপো-ভাগিনেয়ীদের জন্য খেলনা, বন্ধুদের জন্য মোটা রঙ্গীন কাগজের তৈরী অন্যান্য চিজ। প্রতিজ্ঞা করবেন "না, আর কাশ্মীর নয়। সমগ্র ছবিটী ঘরে আছে, কাশ্মীরে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই।"
কিন্তু পরের বছর আবার আপনাকে কাশ্মীর আসতেই হবে, এম্নি কাশ্মীরের যাদু। আবার নতুন করে শুরু হবে আপনার অভিজ্ঞতার যাচাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আনসারুল ইসলাম

[অভ্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল লেখার বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

Comments

Name

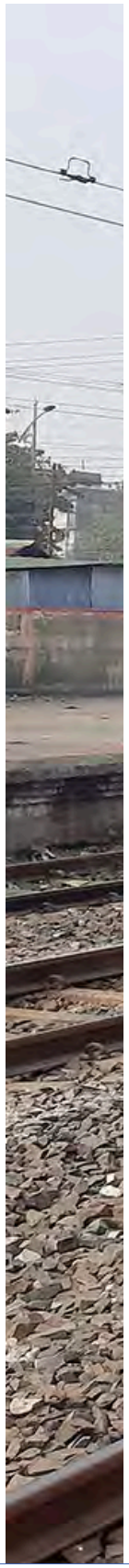

রল নিয়ে আলোচনায়

তপন পাল

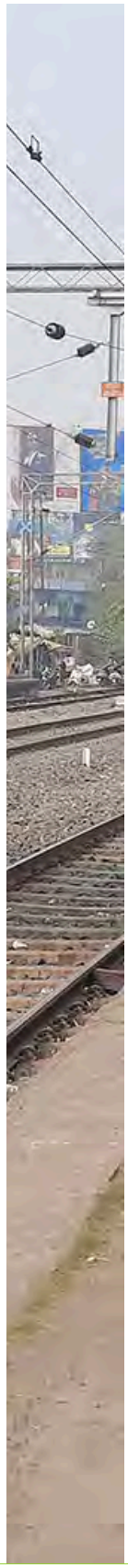

প্রথম পর্ব – শিলিগুড়িতে

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে। দোলা লাগে, দোলা লাগে, তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে॥

শেষ কবে আমি দার্জিলিং মেলে চড়েছি? আজ্ঞে বাবু, ২৯ অক্টোবর, ২০১৭। তখন চাকরি করতাম এবং সেইসূত্রে প্রায়শই ডুয়ার্স যেতে হত। বিমানেই যেতাম আসতাম, তবে সেবারে বড়সাহেবকে বলে রেলগাড়িতে গিয়েছিলাম। চাকরিটা যাওয়ার পর রেলচর্চার সূত্রে, এবং ২০২২ -এর এপ্রিলে শিলিগুড়িতে ভারতীয় রেলমুগ্ধ সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন আয়োজনের সূত্রে, বেশ কয়েকবার শিলিগুড়ি যেতে হয়েছে – তিনবার বাদে সব যাত্রাই বিমানে; একবার শতাব্দীতে ফিরেছিলাম, আর বন্দে ভারতের উদ্বোধনী যাত্রায় গিয়ে প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রায় ফিরেছিলাম।

এইবারে আমন্ত্রণ পেলাম সেপ্টেম্বরের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং এ আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে; বিষয় Darjeeling Himalayan Railway – Past, Present and Future with Tea Tourism and Toy Train। এবার তাহলে যেতেই হয়। যাওয়ার টিকিটটা ১২৩৪৩ শিয়ালদহ হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেলে। রেলগাড়িটি প্রবাদপ্রতিম, এবং অতি প্রাচীন; এবং এর আদিকাল রহস্যাবৃত। চালু হওয়া ইস্তক ইনি বহতা নদীর মতো এতবার যাত্রাপথ বদলেছেন যে সেই গোলকধাঁধাঁর মধ্যে দিয়ে আসল রেলগাড়িটিকে চিনে নেওয়াই দুষ্কর। শুধু নামটি বাদে বদলে গেছে সবকিছুই।

উইকিপিডিয়া বলছেন ১৮৭৮-এর পয়লা জানুয়ারি এই রেলগাড়ির চলার সূত্রপাত। কিন্তু এই তারিখ কি বিশ্বাসযোগ্য? শিলিগুড়ি টাউন রেলস্টেশন চালু হয় ১৮৭৮-এর ১০ জুন। তাহলে তার আগে দার্জিলিং মেল চালু হয় কীভাবে? দ্বিতীয়ত দার্জিলিং সমতলের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হয় ১৮৮০ সালের ২৩ অগস্ট শিলিগুড়ি (টাউন)-কার্শিয়াং; আর দার্জিলিং পর্যন্ত লাইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৮৮১ সালের ৪ জুলাই। তাহলে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার আগেই তার নামে রেলগাড়ি একটু রাম জন্মানোর আগেই রামায়ণ লেখার গল্পের মত হয়ে যায় না!

১৮৭৮ সালে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনটির সঙ্গে কলকাতা (পরবর্তীকালে শিয়ালদহ) স্টেশনের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় দুই পর্যায়ে – কলকাতা থেকে পদ্মানদীর দক্ষিণপাড়ে দামুকদিয়া ঘাট পর্যন্ত Eastern Bengal State Railway-র সাড়ে পাঁচ ফুটের ১৮৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন; তারপর স্টিমারে নদী পেরিয়ে নদীর অপরপারের সারাঘাট থেকে শিলিগুড়ি North Bengal Railwayর ৩৩৬ কিলোমিটার মিটারগেজ লাইন। ১৯১২র টাইম টেবিলে দেখছি দার্জিলিং মেল শিয়ালদহ থেকে দামুকদিয়াঘাট পৌঁছাচ্ছে রাত আটটা আঠারোয়, আর সংযোগকারী স্টিমার ছাড়ছে রাত আটটা চুয়াল্লিশে, সারাঘাট পৌঁছাচ্ছে রাত নটা নয়ে। ওপারের রেলগাড়ি স্টিমারের লোক তুলে ছাড়ছে রাত নটা চুয়াল্লিশে।

১৯১৫ সালে হার্ডিঞ্জ সেতু (বর্তমানের বাংলাদেশে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশি থেকে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা পর্যন্ত যুক্তকারী পদ্মানদীর ওপর ১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ) নির্মিত হওয়ার পর সমগ্র কলকাতা-শিলিগুড়ি লাইনটি সাড়ে পাঁচ ফুটের ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়। সান্তাহার অবধি ব্রডগেজ চালু হয় ওই বছরেই, আর সান্তাহার থেকে শিলিগুড়ি টাউন ১৯২৬ সালে। তারপর ভূ-রাজনৈতিক কারণে বদলে গেল অনেক কিছু। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরেও কিছুকাল দার্জিলিং মেল শিয়ালদহ-রানাঘাট-ভেড়ামারা - হার্ডিঞ্জ ব্রিজ - ঈশ্বরদী - সান্তাহার - হিলি - পার্বতীপুর - নীলফামারী -হলদিবাড়ি – জলপাইগুড়ি - শিলিগুড়ি পথে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে চলাচল করেছে; কারন র‍্যাডক্লিফ লাইনের উড়নচণ্ডেপনায় তার পশ্চিমে গঙ্গার ওপরে কোন রেলসেতু ছিলনা। কালকূটের 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' উপন্যাসে সেই ইতিহাস বিধৃত। সান্তাহার - গুয়াহাটি রুটে চলাচলকারী অসম মেল এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করত দার্জিলিং

গিয়েছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে; খুলনা আর যশোহর এসেছিল এপারে। মালদা আর মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় চাকরি করেছি ১৯৮১ থেকে ১৯৯২। তখন বর্ষীয়ানদের মুখে শুনেছি কিভাবে ওই দুদিন কাটিয়েছিলেন বদ্ধ ঘরে, আতঙ্কে – এবং তাঁরা কতটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন যখন ১৭ আগস্ট ভারতীয় সেনা শহরের দখল নিয়ে তেরঙ্গা উড়িয়েছিল। আর শ্রীহট্টের বঞ্চনা তো প্রবাদপ্রতিম 'মমতাবিহীন কালস্রোতে বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি'।
তারপর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রেলগাড়ির চলা বন্ধ হল। কলকাতা থেকে সাহিবগঞ্জ লুপ এর মাধ্যমে সাকরিগালি ঘাট, কখনও কখনও সাহিবগঞ্জ ঘাট; তারপর ফেরিতে গঙ্গা পেরিয়ে মনিহারিঘাট। তারপর মিটারগেজ এ কাটিহার এবং বারসোই এর মাধ্যমে কিষণগঞ্জ হয়ে শিলিগুড়ি। ১৯৪৯ সালে কিষাণগঞ্জ-শিলিগুড়ি লাইনটি মিটারগেজ করা হয়। আমার বাবার মুখে এই লাইনের কথা অনেক শুনেছি। ১৯৫৭ তে এ জি বেঙ্গলে যোগদানের পূর্বে তিনি চাকরিসূত্রে এই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতেন। আমার রোগাপ্যাংলা যুবক বাবা ডবল ব্রেস্টেড কোট পরে মিটারগেজের কাঠের কামরায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন একটি সাদা-কালো ছবি বহুদিন আমাদের বাড়ির দেওয়ালে ঝুলত।
ফারাক্কা রেলসহ রাস্তা সেতু (২,২৪০ মিটার) ১৯৭১ সালে চালু হয়, পাতা হয় নতুন কিছু রেললাইন। তার ফলে বারহারোয়া-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া লুপ লাইন, এবং বারহারোয়া থেকে গুমানি ত্রিকোণ এর মাধ্যমে সাহিবগঞ্জ লুপ লাইন সেতু পেরিয়ে মালদহ ও শিলিগুড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়। তদবধি দার্জিলিং মেল শিয়ালদহ - ডানকুনি জংশন - বর্ধমান জংশন – সাহিবগঞ্জ লুপ – বারহারোয়া জংশন (স্টেশনে ঢোকে না, বাইরে থেকে বাঁক নেয়) – চামাগ্রাম – মালদা টাউন - কুমেদপুর জংশন - বারসোই জংশন – কিষাণগঞ্জ - আলুয়াবাড়ি রোড জংশন – নিউ জলপাইগুড়ি জংশন হয়ে চলাচল করছে। ২০০৪ সালে অনেকগুলি বিরতি প্রত্যাহার করে রেলগাড়িটিকে সুপারফাস্ট ঘোষণা করা হয়। ২০২২ এর আগস্ট থেকে এর যাত্রাপথ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে হলদিবাড়ি অবধি বর্ধিত হয়েছে। বর্তমানে এর বিরতি শিয়ালদহ ছেড়ে বর্ধমান জংশন (১০২ কিলোমিটার), বোলপুর শান্তিনিকেতন (১৫৩ কিলোমিটার), মালদা টাউন (৩৩৮ কিলোমিটার), কিষাণগঞ্জ (৪৮৬ কিলোমিটার), নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (৫৭৩ কিলোমিটার), জলপাইগুড়ি (৬০৭ কিলোমিটার) ও প্রান্তিক স্টেশন হলদিবাড়ি (৬৩০ কিলোমিটার)।
২০০০ সালের পয়লা জুলাই শিয়ালদহ রাজধানী চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত দার্জিলিং মেল ছিল শিয়ালদহের সবচেয়ে ইজ্জতদার রেলগাড়ি। ৪৩ আপ ৪৪ ডাউন দার্জিলিং মেল তার হৃতগৌরবের কিছুটা ফিরে পায় ২০০৪ সালে, যখন পথিমধ্যের বেশ কিছু বিরতি প্রত্যাহৃত হয় ও রেলগাড়িটি সুপারফাস্টের স্বীকৃতি পায়।

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার। তোমারে করি নমস্কার।

অতএব নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, আমি শিয়ালদহে। আমাদের মতো শহরতলিতে বড় হওয়া ছেলেপিলেদের কাছে শিয়ালদহ বহির্বিশ্বের ইন্টারফেস। ১৯৭৫-এ এই শিয়ালদহ দিয়েই কলেজযাত্রার শুরু, ২০১৯-এর এক বিষণ্ন অপরাহ্নে এই শিয়ালদহ দিয়েই কর্মজীবনের সমাপ্তি। তাই মনে দম্ভ ছিল, শিয়ালদহ আমার চেয়ে ভালো কেউ চেনে না। কিন্তু অনেকদিন পর যাওয়া, করোনায় ঘরবন্দী, তারপরে যেটুকু ঘোরাফেরা করোনার ভয়ে বিমানে। চার বছর পরে শিয়ালদহে ঢুকে আমি বাঁশবনে ডোমকানা – এ কোথায় এলাম রে বাবা - এতো দেখি শপিং মল! এখানে মহেন্দ্র দত্তের ছাতা তো ওখানে কুকমি গুঁড়া মশলা, এইখানে সেনকো গোল্ড তো সেইখানে চন্দ্রাণী পার্লস, বাঁয়ে কেএফসি তো ডাইনে হলদিরাম। এর মাঝে শিয়ালদার সেই ইষ্টিশনটি গেল কই? তারপরে দেখি প্ল্যাটফর্ম সংখ্যা পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে, হারিয়ে গেছে নয়ের এ, নয়ের বি আর নয়ের সি। দার্জিলিং মেল দেখাচ্ছে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে, কিন্তু আমার চেতনায় বারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম দক্ষিণ শাখায়। তাও অনেক খুঁজেপেতে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেল।
আমাদের রেলগাড়ি এল এইচ বি কামরার, বাইশটি কামরা – Loco – SLR - GS – GS – GS - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - A1 - A2 - H1 – EOG। আগে এই রেলগাড়িতে একটি মিলিটারি কামরা থাকতো কিন্তু ইদানীং আর দেখি না। গাড়িটিতে প্যান্ট্রি বা On board catering নেই, যদিও শুনেছি ঔপনিবেশিক যুগে এর প্যান্ট্রির আহার্য ছিল আহামরি গোত্রের।

আমার সংরক্ষণ বাতানুকূল প্রথম শ্রেণিতে, অর্থাৎ শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় কামরায়। কামরার ক্রমিক 213503C, অর্থাৎ মাত্র দুই বছরের পুরাতন। উঠে দেখা গেল রেলের কিছু কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অতি উচ্চ আধিকারিক ওই কামরাতেই যাচ্ছেন ওই আলোচনাচক্রে যোগ দিতে; পাশের A2 কামরায় আছেন কিছু নবীন রেল উৎসাহী। তারা আমাকে দেখে অবাক, একজন বলেই ফেললেন 'তুমি তো দাদা রেলগাড়িতে যাওয়ার লোক নও; হঠাৎ?' তাকে বোঝালাম, 'রেলগাড়ির আর বিমানের ভাড়া একই, কিন্তু আমার বাড়ি থেকে পাঁচ টাকার টিকিট কাটলেই শিয়ালদহ - সেখানে বিমানবন্দর যেতে হলে পেট্রল, চালকের পারিশ্রমিক নিয়ে অনেকগুলো টাকার ধাক্কা।' সে বলল, 'তুমি আজকাল এত ভাবছ নাকি?' বললাম, 'বাধ্য হয়ে, অবসর নিয়েছি তো! এখন অনেককিছুই ভাবতে হচ্ছে।'

একটি ৬,৩৫০ অশ্বশক্তির WAP 7 প্রজাতির বৈদ্যুতিক লোকো সারা রাস্তা আমাদের টেনে নিয়ে যাবে। সম্প্রতি সাহিবগঞ্জ লুপ লাইন ও বারহারোয়া নিউ জলপাইগুড়ি লাইন বৈদ্যুতায়িত হয়েছে বিপুল বিনিয়োগে – কিন্তু তাইতে দার্জিলিং মেলের গতিবেগ বাড়েনি – এখনও সে শিয়ালদহ থেকে ছাড়ে রাত দশটা পাঁচে, আর নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছায় পরদিন সকাল সোয়া আটটায়। অথচ ২০১৭ তে একই সময়ে শিয়ালদহ ছেড়ে সে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাতো সকাল আটটায়। যাত্রীদের যদি কোন সুবিধাই না হল, তাহলে এত পয়সা খরচা করে বৈদ্যুতায়িত করে কি লাভ হল বাপু! দার্জিলিং মেলের গড় গতিবেগ হাস্যকর, ঘণ্টায় ছাপান্ন কিলোমিটার – যদিও ডানকুনি জংশন থেকে খানা জংশন তার Max Permissible Speed ঘণ্টায় একশো ত্রিশ কিলোমিটার। প্রসঙ্গত, রেলগাড়িটি ISO 9001:2008 Certified।

এখন দার্জিলিং মেল নিউ জলপাইগুড়িতে যাত্রাবিরতি করে না। ২০২২-এর আগস্ট থেকে সে নিউ জলপাইগুড়িতে ডিজেল লোকো জোড়ে। তারপর জলপাইগুড়িতে বিরতি দিয়ে হলদিবাড়ি পৌঁছায় বেলা দশটায়। চালক মহোদয়দের সঙ্গে আলাপ হল; তাঁরা আমাদের নিয়ে যাবেন মালদা টাউন অবধি। সেখান থেকে চারজন চালক উঠবেন – দুজন বৈদ্যুতিক লোকোর চালক, দুজন ডিজেল লোকোর চালক। বৈদ্যুতিক লোকোর চালক দুজন রেলগাড়িটিকে নিয়ে যাবেন নিউ জলপাইগুড়ি জংশন অবধি। তারপর বৈদ্যুতিক লোকোর সামনে জোড়া হবে ডিজেল লোকো – চালিয়ে নিয়ে যাবেন ডিজেল লোকোর চালক দুজন। সোয়া দশটায় ছাড়বে গৌড় এক্সপ্রেস - সেও তখন প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেও আমার ভারি প্রিয় রেলগাড়ি – ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ আমি মালদায় চাকরি করতাম যে!

রেলগাড়ি ছাড়ল দশটা পাঁচে, আর এঁকেবেঁকে শিয়ালদহ থেকে বেরিয়ে খাল পেরোবার আগেই বামদিক থেকে ধেয়ে এল দার্জিলিং মেলের nemesis , দিনশেষের কল্যাণী লোকাল - সে দশটায় ছাড়ে। ছোটবেলা থেকে দেখছি, এই দুই রেলগাড়ির হাড্ডাহাড্ডি – মধ্যিখানে বিধাননগর রোডে থেমেও দমদম জংশন অবধি সে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল। কল্যাণী লোকালরা এইরকমই। আর এক কল্যাণী লোকাল, ৩১৩৩৩, বিকেল চারটে পঞ্চাশে ছাড়ে আর শিয়ালদহ-রাজধানীর সঙ্গে দমদম জংশন অবধি দৌড়ায়। মনে হয় থামতে না হলে সে শিয়ালদহ-রাজধানীর আগেই নয়াদিল্লি পৌঁছাত।

শিয়ালদহ থেকে চারটি লাইন বেরিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার গিয়েছে মাটি ফেলে উঁচু করা জমির ওপর দিয়ে। তার নিচে দিয়ে চলে গেছে অনেক রাস্তা, এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেক সর্পিল খাল। সাহেব প্রযুক্তিবিদদের দূরদৃষ্টি ঈর্ষণীয়; বর্ষার জমা জল যেন রেলগাড়ি চলাচলে বিঘ্ন না ঘটাতে পারে সেইজন্যই এমন ব্যবস্থা। রেললাইন বসানোর আগে, এতদঞ্চলের ভূমির স্বাভাবিক ঢাল পূর্বে হওয়ায় হুগলী নদী থেকে প্রচুর জল ছোট ছোট জলধারাবাহিত হয়ে এখন আমরা যাকে East Calcutta Wetlands বলি, সেখানে গিয়ে পড়ছিল। রেলপথ সেই স্বাভাবিক জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করায় শহরে জল জমছিল এবং নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছিলো – এমনটিই জানাচ্ছে সেকালের সংবাদপত্র। বিরক্ত হয়ে

জলপ্রবাহ বাড়ানো।
তবে আমার বিস্ময় অন্যত্র। সেই যুগে (১৮৬২-র ২৯ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ স্টেশনের পথ চলা শুরু Eastern Bengal Guaranteed Railway র হাত ধরে। তখন স্টেশনটির নাম ছিল বেলিয়াগুটটা, ১৮৮৭ সালের ১ এপ্রিল নাম বদল হয়। ক্যানিং লাইন চালু হওয়ার পরপরই চালু হয় রানাঘাট লাইন), যখন ছিল না বুলডজার আর্থমুভার, কিভাবে এই বিপুল পরিমাণ মাটি সরানোর কাজ হয়েছিল!
বিধাননগর রোড পেরোলাম। কর্মজীবনের শেষ তিন বছর আমার অফিস ছিল এই স্টেশনের গায়েই, জানালার মোটা কাচের ওপারে দশতলা আলোকোজ্জ্বল ভবনটি দেখে হৃদয়ে একটু যে চিনচিনানি বাজল না এমনটি নয়। তারপর কেষ্টপুর খাল, দমদম জংশন পেরিয়ে আমরা উড্ডীন। পেরিয়ে গেল বরাহনগর রোড, দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে আমি কপালে হাত ছোঁয়ালাম না দেখে পাশের বর্ষীয়ান সহযাত্রীটি জানতে চাইলেন 'আপনি কি ব্রাহ্ম?' ভারি অবাক হলাম, আমার তিনকুলে কেউ কোনদিন ব্রাহ্ম হয়নি – পিতৃকুল হুগলী জেলার শাক্ত, মাতৃকুল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বৈষ্ণব, পিতা নাস্তিক, আমিও তাই।
বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা পাশাপাশি, আমরা বিবেকানন্দে (Wellingdon Bridge)। শ্যামবিটপীঘন-তট-বিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে পেরিয়ে বালিঘাট, বালি হল্ট, রাজচন্দ্রপুর, Calcutta Chord Link Cabin - লাইন এখানে ত্রিধারা; ডাইনেরটি তীব্র বাঁক নিয়ে গেছে হাওড়া বর্ধমান জংশন কর্ড লাইনের বেলানগর স্টেশন, মাঝেরটি গেছে হাওড়া বর্ধমান জংশন কর্ড লাইনের ডানকুনি জংশন, আর বামেরটি গেছে ভট্টনগর বালটিকুরি বাঁকড়া নয়াবাজ হয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলের হেফাজতে। ২২২০১ শিয়ালদহ পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস এই লাইনে যায়।
Calcutta Chord Link West, ডানকুনি জংশন। ঘড়িতে পৌনে এগারোটা, গাড়ি এতক্ষণ ছিল একশো দশে, এবারে একশো তিরিশ নেবে। আমাদের কামরা রেকের একদম শেষে, তাই পাশাপাশি দুলুনি (roll motion) খুব বেশি। এবারে শুয়ে পড়তে হয়। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এই যে রাত্রির নৈঃশব্দ্য চিরে তীব্র আলো জ্বালিয়ে সশব্দে রেলগাড়ি যাচ্ছে, এতে রেললাইনের পাশের ঝোপঝাড়ের পোকামাকড়দের, বেজিদের, ব্যাঙেদের, সাপেদের, ইঁদুরদের; বা রেললাইনের পাশের উঁচু গাছে বাসা বাঁধা পাখপাখালিদের কতই না অসুবিধা হচ্ছে। রেলগাড়িটিকে দেখে, লোকোর হেডলাইট দেখে তারা এটাকে কি ভাবছে!!

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।

ঘুমের মধ্যে পেরিয়ে গেল কামারকুণ্ডু জংশন, মশাগ্রাম জংশন, শক্তিগড় জংশন, বর্ধমান জংশন, খানা জংশন, আমেদপুর জংশন, সাঁইথিয়া জংশন, রামপুরহাট জংশন, নলহাটি জংশন; পেরিয়ে গেল কানা ক্যানাল, ঘিয়া, মশাগ্রামের দুই ডি ভি সি সেচখাল, বাঁকা, কুনুর, অজয়, কোপাই, বক্রেশ্বর, বাতাসপুরের খাল, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বাঁশলোই, পাকুড় খাল, গুমানি নদী; পেরিয়ে গেল বর্ধমান ও বোলপুরের বিরতি। ঘুম ভাঙল রাত সোয়া তিনটেয়, গাড়ি তখন Bonidanga Link Cabin পেরোচ্ছে। এমনিতেই আমি চারটেয় উঠি। যখন চাকরি করতাম, বড়সাহেবের দাঁতখিঁচুনির ভয়ে ভোর না হতেই উঠতে হত; গ্রহীতাবসর জীবনেও অভ্যাসটা রয়ে গেছে। তবু, কি বলবো একে – স্বজ্ঞা না উপজ্ঞা, নাকি পূর্বজন্মস্মৃতি।
১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ আমি চাকরি করতাম মালদায়, ৫৭ আপ ৫৮ ডাউন দ্বিসাপ্তাহিক হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি জংশন - হাওড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চালু হয় ১৯৮৩ তে; সে-ই এই লাইনের প্রথম দিনের বেলার রেলগাড়ি – তার দৌলতেই এই রেলপথের সঙ্গে আমার চেনাশোনা, ভাব ভালোবাসা, মান অভিমান। তখন কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, উত্তরবঙ্গ, পুরী কামাখ্যা, হাওড়া বালুরঘাট, কলকাতা হলদিবাড়ি, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগকারী রেলগাড়িসমূহ, পদাতিক – কেউ ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল দার্জিলিং মেল, কামরূপ এক্সপ্রেস, আর অধুনাবিলুপ্ত হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ও হাওড়া নিউ বঙ্গাইগাঁও জনতা এক্সপ্রেস। তারা মালদহে পৌঁছাত গভীর রাতে, কোটাও ছিল অল্প। ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে মালদহবাসীদের একতম যোগসূত্র ছিল সপ্তাহে তিনদিন আসা সপ্তাহে তিনদিন যাওয়া গৌড় এক্সপ্রেস।
মালদায় এক কৃত্যক অগ্রজ ছিলেন চন্দননগরের লোক, এবং তিনি ছিলেন অতীব গৃহকাতর। গৌড় এক্সপ্রেস ছাড়ার সপ্তাহের তিনদিন তিনি অফিস ছুটির পর আমবাগানের মধ্য দিয়ে তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে ঝলঝলিয়া স্টেশনে (মালদা টাউন) যেতেন এবং গৌড় এক্সপ্রেসের কামরাগুলির গায়ে সস্নেহে হাত বোলাতেন এই ভেবে যে এরা হুগলী জেলার ওপর দিয়ে যাবে। তার সম্বন্ধে বাজারে গুজব চালু ছিল যে একবার তিনি নাকি গৃহকাতরতায় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দু ঘণ্টা ঠা ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনদিক থেকেই কোনও রেলগাড়ি না আসায় শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেন।
Bonidanga Link Cabin থেকে ইউ টার্ন নিয়ে বনিডাঙ্গা, ফের গুমানি নদী পেরিয়ে বিন্দুবাসিনী, তিলডাঙা – তারপর সেই গুমানি ত্রিকোণ, ফিডার ক্যানাল পেরিয়ে New Farakka S Cabin, তারপর নিউ ফরাক্কা জংশন - বারহারোয়া আজিমগঞ্জ কাটোয়া লাইন এখানে এসে মিশল। তারপর New Farakka N Cabin পেরিয়ে সেতুতে। নিচে অনেক জল, তাই পেরিয়ে আমরা মালদহ জেলায়; চামাগ্রাম, খালতিপুর, জামিরঘাটা পেরিয়ে পাগলা নদী – সর্পিল নদীটি ফরাক্কার উত্তরে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। লোককাহিনি বলে পাগলা হচ্ছে গঙ্গার পাগলাটে ছোট ভাই, দিদিকে সে বড় ভালোবাসত। বিবাহের পর দিদির স্বামীগৃহে গমন সে মেনে নিতে পারেনি, সততই সে দিদিকে খুঁজতো, তাই তো বারে বারে সে খাত বদলায়। তবে একদিন না একদিন দিদির সঙ্গে সে মিলবেই। তথ্যও তাই বলছে, বিগত এক শতকে পাগলা গঙ্গার ব্যবধান কমেছে অনেকখানিই। গৌড় মালদা পেরিয়ে, গঁদ্রাইল সেতু পেরিয়ে শহর শুরু, মালদা মেডিকাল কলেজ, মালদা মহিলা কলেজ, মালদা কলেজ পেরিয়ে রাজমহল রোডের উড়ালপুল, এর কাছেই এক সরকারি আবাসনের টঙের ঘরে আমার দাম্পত্যের শুরু। অগ্রজ সহকর্মীরা বলতেন, 'গোদাবরী তীরে, কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে। বাঁধি নীড় থাকে সুখে।' অবশেষে মালদা টাউন স্টেশন। স্টেশনটি অর্বাচীন, ১৯৭১ সালে ফরাক্কা সেতুর প্রেক্ষিতেই তার নির্মাণ।

আরও একটু পিছিয়ে গেলে, লালগোলাঘাট থেকে স্টিমারে পদ্মা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে গোদাগাড়িঘাট থেকে মিটারগেজের রেলগাড়ি ধরে আমনুরা রোহণপুর সিঙ্গাবাদ মালদা কোর্ট ওল্ড মালদা হয়ে কাটিহার। ১৯৪৩ এর ব্র্যাডশতে ১৯/২০ শিয়ালদহ কাটিহার প্যাসেঞ্জারের এই যাত্রা পথই দেখানো আছে। ১৯১৫য় হার্ডিঞ্জ সেতু চালু হওয়ার পরেও এই পথ চালু ছিল। সম্ভবত দেশভাগের পরবর্তীকালে তা বন্ধ হয়। একটু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। জেলাশাসকের সেরেস্তার সর্বকনিষ্ঠ আধিকারিক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল রেলস্টেশন থেকে জেলাশাসকের নামে প্রেরিত নানাবিধ মাল খালাস করা। তখন দেখতাম অনেক মাল আসত মালদা কোর্ট স্টেশনে। প্রবীণ করণিকদের – তাদের অনেকেই দেশভাগের পর ওপার থেকে অপশন দিয়ে এপারে চাকরিতে বহাল – শুনতাম এটি ঔপনিবেশিক লিগাসি, দেশভাগের আগে জেলাশাসকের নামে প্রেরিত মাল মালদা কোর্ট স্টেশনে আসত, এখনও আসছে।

চল্লিশ বছর আগে যখন মালদায় থাকতাম, তখন মালদা বাচামারির গীতা আচার ছিল অতিখ্যাত। আমার সুবিস্তৃত আত্মীয়কুলে তার চাহিদা ছিল আকাশছোঁয়া। তবে শেষবার যখন মালদা গেলাম মালদা ডিজেল লোকোশেড দেখতে, বিস্তর খুঁজেও গীতা আচারের দেখা মিললো না – তিনি গীতাবর্ণিত 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি'র মত নব নব রূপে দেখা দিয়েছেন। মালদা টাউন স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি বেশ বড়সড় আচারের দোকান আছে। কিন্তু আমরা ঢুকবো চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে; দশ মিনিটের বিরতি – এর মধ্যে আমার বুড়ো হাড়ে অতিকায় ফুটব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে আচার কিনে ফের ফুটব্রিজ পেরিয়ে ফিরে আসা অনিশ্চিত। আর ফেরার সময় টিকিট ১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেসে, তিনি মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছবেন রাত পৌনে একটায়। অতরাতে নিশ্চয়ই আচারের দোকান খোলা থাকবে না।

আমি রেলের পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার একটি কিশোরকে ধরলাম। 'বাবা! বুড়ো মানুষের একটা উপকার করবে। আচার এনে দেবে?' সে বলল, 'টাকা দিন।' আমি তার হাতে টাকা দিয়ে বললাম 'পাঁচটা বড় বোতল নিও, চারটে আমাকে দিও, একটা তুমি রেখো।' সে টাকা নিয়ে আচারের দোকানদারকে ফোন করে দিল। রেলগাড়ি মালদা টাউন স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই দেখি আচারের দোকানদার পাঁচটা বড় বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে।

ঘড়িতে তখন সোয়া চারটে। দশ মিনিটের বিরতি। এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে দিনের প্রথম কাপ চা। সেখান থেকে এগিয়ে ডাইনে ঘুরে মহানন্দা পেরিয়ে ওল্ড মালদা জংশন – এখান থেকে পূর্বদিকে একটি লাইন গেছে সিঙ্গাবাদ হয়ে বাংলাদেশের রোহণপুরের দিকে। তারপরে আদিনা, একলাখি জংশন – এখান থেকে পূর্বদিকে একটি লাইন গেছে বালুরঘাটের দিকে। নাগরি নদী পেরিয়ে মহানন্দা সেতু, সামশি, ভালুকা রোড, হরিশচন্দ্রপুর, কুমেদপুর জংশন, এখান থেকে পশ্চিমদিকে একটি লাইন গেছে কাটিহারের দিকে। এখানেই মালদা জেলা শেষ, এর পরেই বিহার। কিছুটা গিয়ে মুকুরিয়া জংশন - এখান থেকে পশ্চিমদিকে একটি লাইন গেছে কাটিহারের দিকে। তারপরেই বারসোই জংশন – এখান থেকে পূর্বদিকে গেছে রাধিকাপুর লাইন। আর কিছুটা গিয়ে কিষাণগঞ্জ। গাড়ি থামল, দুমিনিটের বিরতি, তখন বাজে সাড়ে ছটা।

সকাল হতেই রেললাইনের ধারে দেখা যেতে লাগলো সেই 'সর্বভারতীয়' পরিচিত দৃশ্য, নাইপুল (Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul; 17 August 1932 – 11 August 2018)-এর ভাষায় 'Indians defecate everywhere. They defecate, mostly, beside the rail tracks'; আমার চিন্তা বেড়ে গেল। উপমহাদেশে anatomically modern humans এর বসবাসের প্রমাণ পঁচাত্তর হাজার বছরের পুরাতন; আর রেলগাড়ি এখানে এসেছে বড়জোর দুশো বছর। এই দুশো বছরের আগের চুয়াত্তর হাজার আটশো বছর ভারতীয়রা কোথায় প্রাতঃকৃত্য সারতেন, বা ভারতীয়রা এই কাজের জন্যে রেললাইনকেই এত প্রাসঙ্গিক ভাবেন কেন – নাইপুল বেঁচে থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম। নাইপুল পছন্দ না করতে পারেন, তিনি না জানতে পারেন যে আমাদের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে দিন ও রাতের তাপমাত্রার তীব্র তারতম্যের জন্য রেললাইনের সঙ্কোচন প্রসারণে ভোরবেলার দিকে রেললাইনে প্রায়ই ফাটল ধরে, রেলের ভাষায় যাকে বলে RAILWAY TRACK CRACK। এই ফাটল দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। রেলকর্তৃপক্ষকে একরকম ফাটলের খবর দিয়ে প্রাণহানি এবং রেলের সম্পত্তিহানি শহুরে নাক সিঁটকানো বাবুরা রোধ করেন না, করেন এই সব গ্রামীণ প্রান্তিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তিবাসী মানুষেরা।

ওল্ড মালদা জংশন পেরিয়ে শুরু হয়েছিল আমবাগান, এইবার তার জায়গা নিল চা বাগান। পাঞ্জিপাড়া, ইকরচালা পেরিয়ে সেই গাইসল। ২ আগস্ট, ১৯৯৯; রাত পৌনে দুটো। দিল্লি থেকে আসা অবধ আসাম এক্সপ্রেস মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছিল দিল্লিগামী ব্রহ্মপুত্র মেলকে; এই গাইসলে। কিষাণগঞ্জে সিগন্যালের ভুলে অবধ আসাম এক্সপ্রেস ভুল লাইনে চলে আসে। সেখান থেকে গাইসল উনিশ কিলোমিটার। এবং এই উনিশ কিলোমিটারে কেউ – রেলগাড়ির চালক, গার্ড, ইকরচালা ও পাঞ্জিপাড়া স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, কেবিনম্যান, লেভেল ক্রসিঙের গেটম্যান – কেউ দেখল না যে রেলগাড়িটি ভুল লাইনে চলছে। একেই কি Collective Amnesia বলে? সরকারি হিসাবে মৃত ২৮৫, স্থানীয়রা বলেন হাজার, নব্বইজন সৈন্য সহ। দুর্ঘটনার পর আমি সেখানে গিয়েছিলাম। স্থানীয়দের অবিশ্বাস করার মত কিছু দেখিনি। দুর্ঘটনাকবলিত কামরাগুলির মধ্যে সাতটি ছিল জেনারেল কামরা – তাদের বহনক্ষমতা সরকারিভাবে বাহাত্তর; বাস্তবে একটি অসংরক্ষিত জেনারেল কামরায় কত যাত্রী থাকে তা কি আর আমরা জানিনা! এমনটাও শোনা গিয়েছিলো যে সেনাবাহিনীর কামরায় বিস্ফোরক পরিবাহিত হচ্ছিলো; সেইজন্যই দুর্ঘটনাকালে বিস্ফোরণ ঘটে অভিঘাত তীব্রতর হয়।

উপমহাদেশে রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম দিন থেকেই অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিকতার সঙ্গে তার প্রবল সম্পর্ক। সত্যজিৎ রায়ের ফার্স্ট ক্লাস কামরা বা অমিতাভ ঘোষের The Calcutta Chromosome সেই জনচেতনার অভিজ্ঞান। আর তার সবটুকুই কি কল্পনা! ৫ই মে, ২০১৫, দমদমগামী পাতাল রেলের চালক দেখেছিলেন নেতাজি ভবন আর রবীন্দ্র সদনের মধ্যে রেললাইন ধরে কে যেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি রেলগাড়ি থামিয়ে দেন, কন্ট্রোলে জানানো হয়, বিস্তর খোঁজাখুঁজি হয়; কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় নি। রেলগাড়ির চালকরা সদাসতর্ক মানুষ, তাদের দৃষ্টিশক্তি ঈর্ষণীয়। তবুও...। ভারতের নানা জায়গা

হানাবাড়ি; চলন্ত রেলগাড়ির আওয়াজ শোনা যায় যখন তখন, এক তরুণ যুক্তিবাদী রেল অনুরাগী আমাকে একবার জানিয়েছিল যে সে ছবি তুলবে বলে চলন্ত রেলগাড়ির জানালার পাশে ক্যামেরা বাগিয়ে বসেছিল, এবং ঠিক ওইখানে গিয়ে ক্যামেরা পাগলামো শুরু করেছিল। তারপরেই আবার সব ঠিকঠাক।

মেঘলা আকাশ, রেললাইনের পাশে চা বাগান, গাছপালা। গাড়ি চলছে দ্রুত, সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। তারপর আলুয়াবাড়ি রোড জংশন – শিলিগুড়ি শাখা লাইন এখান থেকে শিলিগুড়ি গেছে। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এই পথে যায়। রেলগাড়ির কামরায় উঠে এল বয়েলড দেশি ডিম। তাই দেখেই আমার আমার মন বলে, 'চাই চা ই, চাই গো– যারে নাহি পাই গো।' সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে 'নাই, নাই নাই গো।'
ধূলাবাড়ি, দাহুক নদী পেরিয়ে মাঙ্গুরজান। তিন মাইল হাট, ধুমডাঙ্গি পেরিয়ে ফের মহানন্দা; তাকে পেরিয়ে চটেরহাট। নিজবাড়ি, রাঙ্গাপানি – শহর শুরু। তার পরেই নিউ জলপাইগুড়ি জংশন। তখন বাজে আটটা দশ।
শিলিগুড়ির প্রবীণদের কাছে শুনেছি, একদা শিলিগুড়ি শহরের জীবনচর্চা ছিল দার্জিলিং মেলের সুরে বাঁধা। সকালে সে ঢুকলে শহর ঘুম থেকে জাগত, সন্ধ্যায় সে ছেড়ে গেলে মানুষজন শুতে যেত। দার্জিলিং মেলের যাত্রাপথ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে হলদিবাড়ি অবধি বর্ধিতকরণ তাই অনেক শিলিগুড়িবাসীর মনেই বুকে বেজেছিল গোপন দুখে; মর্মে রেখে গেছে গভীর হৃদয়ক্ষত।
রিটায়ারিং রুমে আশ্রয়।

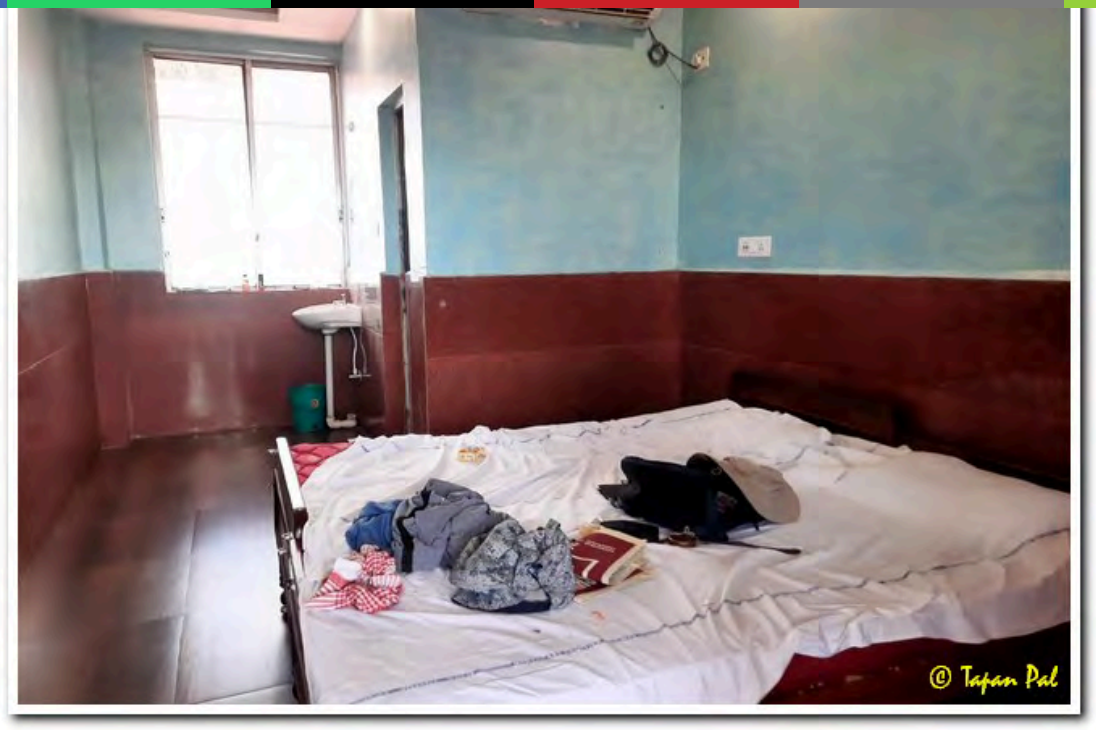

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে ॥

অতঃপর! এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো। আলোচনাচক্রের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে বেলা একটায়। সংগঠক কর্তাব্যক্তিরা কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না কারণ পরবর্তী অনুষ্ঠানটি অর্থাৎ মূল আলোচনাচক্র শহর থেকে কিছুটা দূরে সুকনার কাছে গুলমা মোহরগঞ্জ চা বাগানে। তাঁরা সকালবেলাতেই চলে গেছেন সেখানে। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে তিনজন, তাদের মধ্যে প্রবীণতম হওয়ার সুবাদে আমি তাদের নেতা।

একদা শিলিগুড়ি জংশন ছিল এই এলাকার প্রধান রেলস্টেশন। দেশভাগের পর শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার ব্রডগেজ রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় কারন মধ্যবর্তী রেলপথের অনেকটাই চলে যায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল পরিচালিত স্টেশনটিতে বর্তমানে প্ল্যাটফর্ম ছটি, পাঁচটি ব্রডগেজ ও একটি দু ফুটের ন্যারোগেজ। নিউ জলপাইগুড়ি – আলিপুরদুয়ার - শামুকতলা রোড, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবং কাটিহার - শিলিগুড়ি লাইন এখানে মিশেছে। ১৯৪৯ এ পথ চলা শুরু করে এই স্টেশন, বৈদ্যুতায়িত হয় ২০২০ তে। Executive Lounge আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল - সেখানেই জমায়েত।

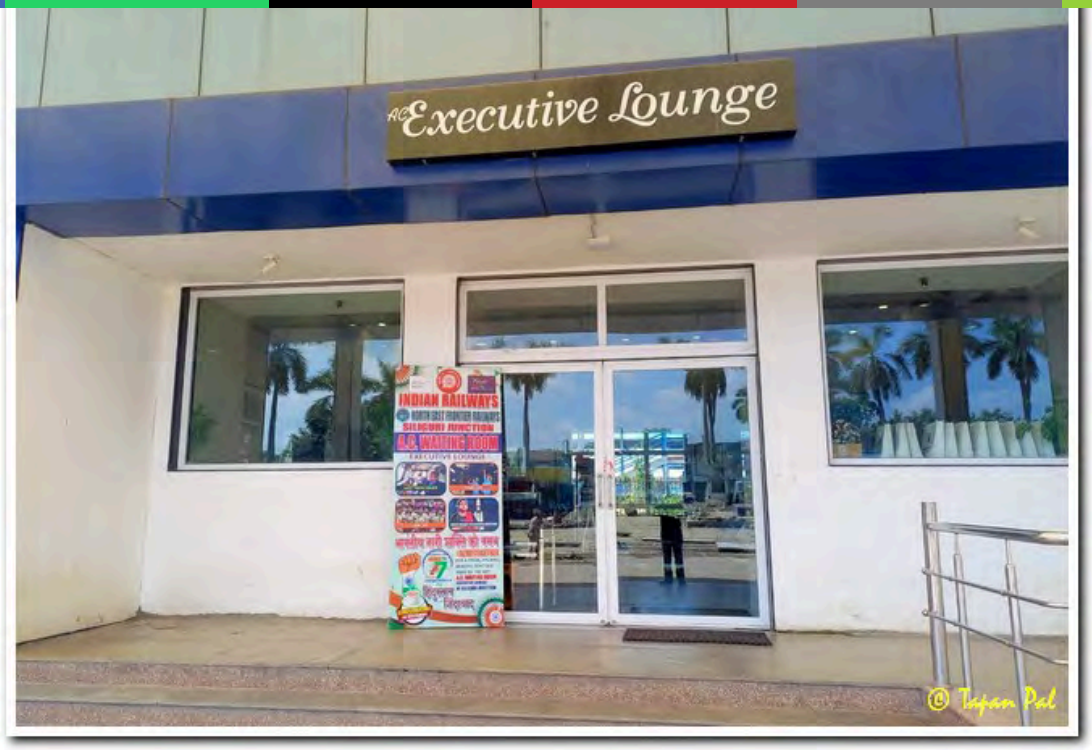

আমাকে কিছুই করতে হল না। নব্য প্রজন্ম চমৎকারভাবে পুরো কার্যক্রমটি সামলালেন। পারস্পরিক পরিচিতি, রেলচর্চায় তাদের উৎসাহের ক্ষেত্র বর্ণনা, শুভেচ্ছা বিনিময়, স্বল্প বক্তব্যে পাহাড়ে চা শিল্প, পর্যটন শিল্প ও খেলনা রেলগাড়ির প্রাসঙ্গিকতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার আর্থ সামাজিক ইতিহাস বর্ণন ইত্যাদি ইত্যাদি – শেষ বিষয়টি এই আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায়।

তারপর অনেকখানি হেঁটে আমরা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের লোকোশেডে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে তাদের লোকো শেড ও ওয়ার্কশপ দর্শন। জায়গাটি UNESCO Heritage Site। খেলনা রেলগাড়ির লোকো ও কামরার রক্ষণাবেক্ষণ হয় এখানে। অনেকগুলি ভিস্তাডোম কামরা তৈরি হচ্ছে দেখলাম। ১৯১১ সালে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে তাদের একমাত্র Garratt-type of articulated steam loco (built by Beyer Peacock in UK) পান। ১৯৪৮ সালের ২০ অক্টোবর ভারত সরকার দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কিনে নেন। ভারতীয় রেলের অংশ হয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এখন এটি পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের কাটিহার বিভাগের অন্তর্গত।

তৎপরে হিলকার্ট রোড ধরে, পাঁচাই নদী দুবার পেরিয়ে দশ কিলোমিটার দূরের গুলমা মোহরগঞ্জ চা বাগানে। পথে ছুঁয়ে গেলাম শহরের প্রাচীনতম স্টেশন Siliguri Town (SGUT)। দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে ডাইনে ঘুরে পাঁচাই নদী; এই বর্ষায় তাইতে ভালোই জল। সেই নদী দুবার পেরিয়ে গুলমা মোহরগঞ্জ চা বাগান। ১৮৮৬ সালে, যখন চা বাগান শিল্পে সাহেবদের একাধিপত্য, বাঙালি উদ্যোগপতি বিপ্রদাস পালচৌধুরী মোহরগঞ্জ চা বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে তার পুত্র অমিয় পালচৌধুরী এক ব্রিটিশ কোম্পানির কাছ থেকে সংলগ্ন গুলমা চা বাগান কিনে নেন। সেই পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের হাতে এখন তরাই পাদদেশের গর্ব গুলমা মোহরগঞ্জ চা বাগান, বার্ষিক উৎপাদন ৭০০ মিলিয়ন কাপ চা। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই প্যাকেজিং হয় বলেই তাদের চায়ের এত সুনাম।

চা বাগান কর্তৃপক্ষ চা বাগানটি ঘুরিয়ে দেখালেন। দেখালেন চাষ থেকে পাতা উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ থেকে প্যাকেজিং। প্রক্রিয়াকরণের জন্য মস্ত কারখানা। এক কাপ চায়ের পিছনে যে এত মানুষের এত শ্রম থাকে তা আগে কে জানত! তারা বোঝালেন কাকে বলে ফার্স্ট ফ্লাশ আর কাকে বলে ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো; খাইয়ে দেখালেন তাদের পারস্পরিক পার্থক্য। ছাঁদা বাঁধতে প্যাকেট প্যাকেট চা-ও দিলেন অকাতরে।

Darjeeling Himalayan Railway – Past, Present and Future: With Tea, Tourism and Trains আলোচনাচক্রের সারস্বত পর্যায়টি ছিল এইখানে – রেলচর্চাকারীরা ছাড়াও ছিলেন উচ্চপদস্থ রেল আধিকারিকেরা, চা শিল্পের লোকেরা, পর্যটন শিল্পের লোকজন। বিলাতের Darjeeling Himalayan Railway Society-র সদস্যরা যোগ দিলেন সশরীরে ও ভিডিও মাধ্যমে।

Darjeeling Himalayan Railway-র আছে এক বর্ণাঢ্য অতীত; কিন্তু অতীত ধুয়ে খেয়ে তো পেট ভরবে না; বাঁচতে হবে বর্তমানে, ভবিষ্যতের জন্য। আলোচনাচক্রে বক্তারা সেই পথেরই সন্ধানী। Darjeeling Himalayan Railway এখন লাভের মুখ দেখছে, পর্যটকদের জন্য তাদের জয়রাইডগুলির হাত ধরেই এই ঘুরে দাঁড়ানো। সারা বিশ্ব যখন বাষ্পীয় লোকোকে বিদায় জানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, Darjeeling Himalayan Railway 'পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে ওগো নবীন রাজা। শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তার পরান মাঝে ওগো নবীন রাজা' - কু উউউউউউ বাঁশি বাজিয়ে Darjeeling Himalayan Railway র বাষ্পীয় লোকোরা আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা ৩৬৫ দিনই বাষ্পীয় লোকো চালান। নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে ব্যতিরেকে পৃথিবীর আর কোন সংস্থা এমনটি করেন কি না আমার জানা নেই।

Siliguri Town (SGUT) স্টেশন নিয়ে আলোচনা গড়াল অনেকদূর। বস্তুত এই আলোচনাচক্রের উৎসমূল ওই স্টেশন। হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রায় যাওয়া, আর নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রায় ফেরা – এর মাঝে হাতে ছিল একটি দিন – ৩১ ডিসেম্বর ২০২২। তখন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন খুব খুঁটিয়ে দেখি - দু ফুটের ন্যারোগেজ ও সাড়ে পাঁচ ফুটের ব্রডগেজ – সঙ্গে স্মারকরূপে কিছুটা মিটারগেজ লাইন। দুটি ব্রডগেজ প্ল্যাটফর্ম, একটি ন্যারোগেজ। North Bengal State Railway-র এই স্টেশনের পথ চলা শুরু ১৮৮০-তে, বৈদ্যুতায়িত ২০২০-তে। স্টেশনের গায়ের হকার্স কর্নার চিরে ন্যারোগেজ লাইন হ্যানয়ের Train Street বা থাইল্যান্ডের Maeklong Railway Market-এর কথা মনে পড়ায়। দার্জিলিং মেল একদা এই স্টেশন থেকেই ছাড়ত। সব ছাপিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছিল স্টেশনটিকে ঘিরে ক্রমেই জবরদখল হয়ে যেতে থাকা বিশাল জমি। শহরের কেন্দ্রস্থলে এত প্রাচীন এই স্টেশনটির দুর্দশা আমাদের নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর আমাদের এক তরুণ বন্ধু বিলাতের Darjeeling Himalayan Railway Society-কে এ বিষয়ে দীর্ঘ চিঠি লেখেন এবং তারা সক্রিয় হন। তারই পরিণতি এই আলোচনাচক্র।

স্থানীয়দের একটি দীর্ঘকালীন দাবি ১২০৪১ হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস ও ১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেসকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন অবধি নিয়ে আসা হোক, কারণ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন বস্তুত শহরের বাইরে; শহরের জনগণ তাই ভোররাতে রেলগাড়ি ধরতে বা প্রায় মাঝরাতে রেলগাড়ি থেকে নেমে বাড়ি পৌঁছতে প্রায়ই বিড়ম্বনায় পড়েন। কিন্তু পরিকাঠামোগত ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতায় তা সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে স্টেশনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে তার বাণিজ্যিক ব্যবহার ছাড়া গতি নেই। শহরের কেন্দ্রে স্টেশনটির জমিতে একটি ম্যল গড়ে উঠলে, স্টেশনটি থেকে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের নামাঙ্কিত টুপি, চাবির রিং, ফ্রিজ ম্যাগনেট, ব্যাগ ইত্যাদি স্মারক বিক্রির ব্যবস্থা হলে স্টেশনটি হৃতগৌরব হয়তো ফিরে পাবে।

তারপর চা বাগানের কর্মীদের আদিবাসী নৃত্য। অতঃপর নৈশভোজ। গভীর রাত্রে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের রিটায়ারিং রুমে প্রত্যাবর্তন।

(আগামী সংখ্যাতে সমাপ্য)

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

Comments

Name

Enter your comment here

Comment | Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

চেনা পুরীর অচেনা ঠিকানায়

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

২০১৬ সাল। মার্চের মাঝামাঝি। সকালবেলাতেই গনগনে সূর্যের আলো সমুদ্রের জলে যেন ঠিকরোচ্ছে। সাগরের নোনা গন্ধ, উঁচু উঁচু ঢেউ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত নীল জলের বিস্তার আর চিরচেনা বাঙালি পর্যটকের ভিড় – পুরী সবসময়েই সাদরে আহ্বান জানায়।

সমুদ্রে স্নান করতে চিরকালই ভাল লাগে। কিন্তু এবারে শরীর খারাপের জন্য বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারছি না, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। স্থানীয় কোস্ট-গার্ডদের বসানো গার্ডেন আমব্রেলার ছায়ায় মায়ের পাশে চেয়ারে বসে থাকতেই আরাম লাগছে। দীপ একাই দুহাতে আমাদের সতেরো বছরের কন্যা আর ছ'বছরের ভাইঝিকে সামলাচ্ছে। আমার মেয়ে প্রায় মাছের মতোই জল ভালবাসে। সাঁতারও জানে। কিন্তু সে-ও পুরীর এই উত্তাল ঢেউ আর পায়ের তলায় বালি সরে যাওয়াটায় খুব স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না। ওড়িশায় সুপার সাইক্লোনের পর বিচের বালিয়াড়ি বেশ ভেঙে গেছে জায়গায় জায়গায় – ঢেউয়ের তোড়ে সরে যাওয়ার পর আচমকাই জলের তলায় পা নেমে যায় দু-এক ফুট নিচে।

সময় কীরকম বদলে যায় –মায়ের সঙ্গে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসি। বেড়াতে এসে সত্তোরোর্ধ মা চল্লিশোর্ধ আমার থেকে বেশি চনমনে রয়েছেন। 'আমাদের ছেলেবেলায় এদেরই বলা হত নুলিয়া। ছোটবেলায় তোদের যখন নিয়ে এসেছি তখনও। রোগা রোগা চেহারার মানুষগুলো গাড়ির টায়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াত লোকজনকে সমুদ্রে স্নান করানোর জন্য। আর এখন 'কোস্ট গার্ড' জ্যাকেটে অনেক সফিস্টিকেটেড দেখতে, বাড়তি রোজগারের জন্য চেয়ারও ভাড়া দিচ্ছে।'

ওদিকে মিষ্টিবিক্রেতারা সমানে হাঁক পেড়ে ঘুরে যাচ্ছে– মদনমোহন, রসগোল্লা...। যেকোনোরকম মিষ্টির প্রতি আমার দুর্বলতা চিরকালের। ইদানীং ডায়াবেটিসের জন্য নিজেকে বেশ সামলে চলতে হয়। কিন্তু আগে কখনও 'মদনমোহন' খাইনি, আর জীবনে একবারই তো বাঁচব। ফলে চেঁচিয়ে ডাকি– মদনমোহন খাব। খেতে অনেকটা বাংলার কমলাভোগের মতোই, তবে পিচরঙা আর লম্বাটে আকারের। শালপাতায় নিয়ে সেই মদনমোহন আনন্দ করে খেয়ে ফেলি সবাই। কিন্তু আমার ছোট্ট ভাইঝি ঊর্জার চোখ রঙিন রঙিন বলের দিকে। আকুলভাবে তার 'ইসেমশাই'কে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কাছে কি বল কেনবার টাকা আছে?' তারপর 'ইসেমশাই'-এর সঙ্গে অদূরের একটা খেলনার স্টল থেকে গোলাপি রঙের ডিজনি প্রিন্সেস আঁকা একটা বল কিনে খুব খুশি হয়ে ফিরে আসে। খানিকপরেই আবার আবদার - হয় ঘোড়া নয় উটে চড়ব...। এবারে 'ইসেমশাই' নরম হন না, গম্ভীরভাবে জানান, সবে তো আসা হয়েছে, এখনও অনেক সময় আছে ওইসব করবার জন্য। আরও ঘন্টাখানেক জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে উঠে এসে ডাবের জল খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে সবাই ফিরে চললাম হোটেলের দিকে।

পরেরদিনের গন্তব্য জগন্নাথের মন্দির। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখার উৎসাহই আমার বেশি। বছর পনেরো আগে যখন শিশুকন্যাকে নিয়ে পুরী এসেছিলাম, সেবার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হয়নি, আর ছেলেবেলার দেখা তো আর মনে নেই সেভাবে। পুরীর বিখ্যাত মন্দিরটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গা বংশের চোরগঙ্গার নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। তবে ঐতিহাসিক ফার্গুসনের মতে পুরী হচ্ছে প্রাচীন দন্তপুর যেখানে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের শ্ব-দন্তের ওপর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই মন্দিরটিই জগন্নাথ মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। চোরগঙ্গা সেটির সংস্কার করেছিলেন মাত্র। কথিত যে দেবমূর্তি গড়া শেষ হওয়ার আগেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রানি গুণ্ডিচাদেবীর অনুরোধ এড়াতে না পেরে মূর্তিনির্মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে মন্দিরের দ্বার খুলে দেখেছিলেন। তাই জগন্নাথদেবের মূর্তি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

পুরীর মন্দিরের স্থাপত্য কোনারকের সূর্যমন্দিরকে মনে করায়। যদিও এখানে মন্দিরের 'জগমোহন' অংশ অটুট রয়েছে। কলিঙ্গ স্থাপত্যরীতির সবকটি নিয়ম মেনেই এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম থেকে পুবে মন্দিরের চারটি অংশ – বেলেপাথরে নির্মিত দেউল, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ মণ্ডপ পরপর রয়েছে। মন্দির অঞ্চলকে বেষ্টন করে রয়েছে পাথরের উঁচু পাঁচিল। মূল মন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে বিমলাদেবীর মন্দির, লক্ষ্মীদেবীর মন্দির, ধর্মরাজ অথবা সূর্যনারায়ণ মন্দির, পাতালেশ্বর শিব মন্দির, ভোগ বিতরণস্থল আনন্দবাজার, স্নান বেদি, রন্ধনশালা, বৈকুন্ঠ বা যাত্রীশালা। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে রয়েছে অরুণস্তম্ভ। অষ্টাদশ শতকে কোনারক মন্দির থেকে এনে মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে প্রতিষ্ঠা করা হয় স্তম্ভটি। শোনা যায়, কালাপাহাড়-এর বিধ্বংসী আক্রমণের সময়ে কোনারকের মন্দির থেকে মূল সূর্যদেবতার মূর্তিটি এখানে নিয়ে আসা হয়। সেইটি দেখার কৌতূহল ছিল সবথেকে বেশি। কিন্তু সূর্যদেবের মূর্তি বলে যা পুজো হয় এবং তার পেছনের অদৃশ্যপ্রায় মূর্তিটিও যতটুকু দেখা গেল, খুব একটা বিশ্বাস উদ্রেক করল না। হয়তো সবটাই গল্পকথা।

সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখে, সকালে সমুদ্রস্নান আর বিকেলে সৈকতে হাঁটাহাঁটি করে দিব্যি আরও দুদিন কেটে গেল। কোণার্ক-ভুবনেশ্বর-নন্দনকানন-উদয়গিরি-খণ্ডগিরিকেন্দ্রিক প্রচলিত 'সাইটসিইং'-এ যাওয়ার কোনও ইচ্ছে আমাদের ছিল না, ফিমার-নেক বদলানো মা-কে নিয়ে অতটা ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়ও। কিন্তু দ্বিতীয়দিন দীপ জিজ্ঞাসা করল পটচিত্রের গ্রাম রঘুরাজপুর যাব কিনা? উৎসাহিত হয়ে যোগ করলাম সঙ্গে ধৌলিও ঘুরে আসা যাক। অশোকের শিলালিপি – সেই কবে ইতিহাস বইতে পড়েছি। কিন্তু আসল সমস্যা হল এই গরমে মা আর ঊর্জাকে নিয়ে সারাদিনের জন্য বেরোনোটা। ওরা কি পারবে ধকলটা নিতে? মায়ের উৎসাহের তো কখনোই কমতি নেই, আর ঊর্জা বেরোতে পারলেই খুশি। অতএব ট্যুর প্রোগ্রামে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির আর পিপলিও জুড়ে দেওয়া গেল।

পরদিন সকাল আটটায় গাড়ি নিয়ে হইহই করে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ গরম। সকালেই রোদের তেজ যথেষ্ট। প্রথমে সোজা চললাম ধৌলি। ওড়িশার রাস্তায় যেটা আমার সবচেয়ে চোখে পড়ে, তা হল চওড়া মসৃণ পথের দুপাশে কোনও রাজনৈতিক হোর্ডিং নেই। জ্বলজ্বল করে না নেতা-মন্ত্রীদের মুখ। বাংলার সাম্প্রতিক হাল ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। পথের ধারে এক ধাবায় জম্পেশ ব্রেকফাস্ট সারা হল। এমনকি ধাবার বাথরুমটাও এত পরিষ্কার যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ট্যুরিস্টস্পটে বাথরুমের হালের কথা ভেবে রীতিমতো লজ্জা করল।
ধৌলি – সবুজে ঢাকা শান্ত ছোট্ট একটি টিলা, শুধুমাত্র বৌদ্ধস্তূপের পাশে স্থানীয় শিবমন্দিরের পাণ্ডা-পুরুতদের অত্যাচার বাদে। পথে যেতে যেতেই অশোকচক্রের প্রতীকসহ লৌহস্তম্ভ চোখে পড়েছিল।

কিন্তু অশোকের সেই বিখ্যাত শিলালিপি খুঁজে পাচ্ছিলাম না কোথাও। একটা ঢিবির ওপরে ছেলেবেলার ইতিহাস বই থেকে উঠে আসা হাতির প্রস্তরমূর্তিটি মুগ্ধ করেছিল। শেষপর্যন্ত কেয়ারটেকার আমাদের উদ্ধার করলেন। হাতির ঠিক নিচেই টিলার গায়ে তালাচাবি দেওয়া ঘেরাটোপের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মী হরফে খোদিত অশোকের শিলালিপি। ওপরের দিকের পাথর কেটে হাতির মূর্তিটা তারই চিহ্নস্বরূপ খোদিত হয়েছিল, যাতে টিলাটা দূর থেকেই চেনা যায়।

তালা খুলে দিলে ভিতরে ঢুকে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। কোন প্রাচীনকালে এক রাজার আদেশে কে বা কারা এই মোনোলিথিক টিলাগাত্রের পাথরে এসব হরফ খোদাই করেছিলেন যা আজ এত বছর পরেও বিদ্যমান। এক লহমায় অতীত যেন জীবন্ত হয়ে উঠল চোখে। দুহাজার বছরেরও বেশি আগে ২৬১ খ্রিস্টপূর্বে মৌর্য সম্রাটের ক্ষমতাবিস্তারের আকাঙ্খা পূরণ করতে অনতিদূরের দয়া নদীর জল লাল হয়ে গিয়েছিল রক্তে।

দুলাখেরও বেশি হতাহত হয়েছিল সেই কলিঙ্গ যুদ্ধে। জয়লাভের পর সম্রাট অশোক অনুতপ্ত হয়েছিলেন। হিংসার পথ ত্যাগ করে মানবকল্যাণ তথা বুদ্ধের বাণীপ্রচারের ভার তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় এমনই সব বড় বড় টিলার গায়ে প্রাকৃত ভাষায় খোদাই করিয়েছিলেন তাঁর অনুশাসন।

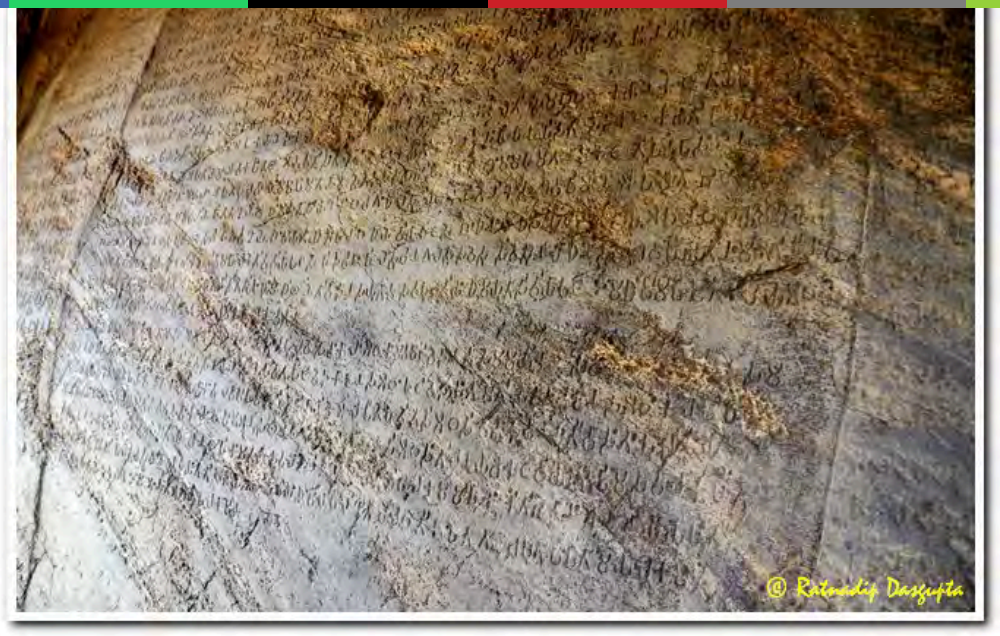

পরের গন্তব্য হিরাপুরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দির। জায়গাটা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। এটা খুব একটা জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট নয়ও। মন্দিরের রাস্তা কেউ ঠিক বলতে পারছেন না, গুগল ম্যাপ ভরসা করে এগোনো। একটা খাল পেরিয়ে মূল রাস্তা থেকে পাশের রাস্তায় নেমে গেছি অনেকক্ষণ। মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে কয়েকজন শেষ রাস্তাটুকুর সন্ধান দিলেন। বিশাল পুকুরের পাশে গাড়ি থামল।

একটু এগিয়ে লোহার ছোট গেট পেরিয়ে সবুজে ভরা বড় চত্বরের একেবারে শেষে মন্দির। গোলাকার ছাদবিহীন মন্দিরটা দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রোদে তখন পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না। জুতো খুলে এক দৌড়ে... নাহ্, মন্দিরের ঢোকার ছোট্ট গলিতে মাথা নিচু করতে হল। দেবীর কাছে আগত ভক্তকে প্রবেশ করতে হবে নত হয়ে। ভেতরে কোথাও রোদ্দুর কোথাও বা পাথরের দেওয়ালের ছায়া। ওইটুকু জায়গার ভেতরে যে এতগুলি দেবীর অধিষ্ঠান তাও ভাবিনি। আবার সেই অবাক হওয়ার পালা। গোল মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালের নীচের দিকে ছোট ছোট কুঠুরিতে সুন্দরী সব দেবী, সুডৌল গঠন তাদের, যেমনটা দেখা যায় চিরাচরিত ভারতীয় ভাস্কর্যে। মূর্তির মুখ কখনও মানুষের, কোনটা বা পশুর। অনেকগুলি মূর্তির হাত বা কোনও অঙ্গ ভেঙে গেছে, তবু মোটের ওপর বোঝা যায়। মোট ষাটটি কুঠুরি। দরজার একেবারে সোজাসুজি মহামায়া মূর্তিটি গ্রামদেবী হিসেবে পূজিত। পরে জেনেছি যে ভারতের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরগুলির মধ্যে একমাত্র এই মন্দিরেই পুজো চালু আছে। মন্দিরের কেন্দ্রে যে স্তম্ভ, তাতে আরও চার কুঠুরির মধ্যে একটি ফাঁকা, বাকি তিনটেতে তিন দেবী। এখানে শিবের মূর্তিও রয়েছে।

বৃত্তাকার মন্দিরটির বাইরের দিকের ডায়ামিটার ৩০ মিটার। ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি মন্দিরটির বৃত্তাকার অংশটি স্যান্ডস্টোন ব্লক দিয়ে তৈরি। মূল দরজাটি একটি ছোট গলি দিয়ে বৃত্তাকার অংশের সঙ্গে যুক্ত। কালো ক্লোরাইট পাথরের স্ল্যাব থেকে কাটা যোগিনী মূর্তিগুলি একেকটি মোটামুটি দু ফিট উচ্চতার। সবকটি মূর্তির ভঙ্গীই দাঁড়ানো অবস্থার। মাটির কাছাকাছি ওপরে আর্চওলা প্রত্যেকটি যোগিনী মূর্তির ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গিগুলিকে একেকটি ক্ষুদ্রাকার মন্দির রূপে ধরা হয়। মন্দিরের পুরোহিত মূর্তি চেনান ঘুরে ঘুরে। আমরাও যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে দেখি – চণ্ডিকা, তারা, নর্মদা, যমুনা, লক্ষ্মী, বারুণী, গৌরী, ইন্দ্রানী, বরাহী, পদ্মাবতী, মূরতী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি বিচিত্ররূপিনী দেবীদের। আমাদের চেনা সরস্বতী মূর্তি থেকে একেবারেই আলাদা এখানকার সরস্বতী। দেবী মূর্তিটি একটি সর্পের ওপর দণ্ডায়মান। ডান কাঁধ থেকে একটি তারের বাদ্যযন্ত্র (তুমুরু) কোনাকুনিভাবে ঝুলছে। মাথার ওপরে চুলগুলি চালচিত্রের আকারে রয়েছে। দেবী বাম হাতে গুম্ফ মোচড়াচ্ছেন।

দেবী বিনায়কী বা গণেশানীর পেটমোটা হাতিমুখো চেহারা দেখলে গণেশের কথা মনে পড়বেই। তবে বাহন গাধা। দুই হাত আর মাথায় জটাজূট বা জটামুকুট। দেবী কালী চিরাচরিত কালীমূর্তিকে মনে করায় এক পায়ের তলায় শিব রয়েছে বলেই। যোগিনী মূর্তিটি দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছে। দুই হাতই অনেকটা ভাঙা। যোগিনীর কাছে একটি ত্রিশূল রয়েছে। মাথার ওপরে খোঁপা। পায়ের তলার পুরুষ মূর্তিটির ত্রিনয়ন। মাথায় মুকুট ও কিরীট। একটি হাত মাথার তলায় রাখা। ত্রিনয়ন বলেই শিব হিসেবে সনাক্তকরণ।

পূজারি আমার অনুরোধে দু-তিনবার ঘুরে ঘুরে সব মূর্তিকে বারবার করে চিনিয়ে দেন। মন্দিরের যেখানে রোদ এসে পড়ছে পা রাখা যাচ্ছে না। মধ্যগগনে থাকা সূর্যের তাপ কাপড়ের টুপি ভেদ করে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু অবাক হতে আশ্চর্য হতে

মূর্তির পায়ের কাছে চৌকো আকারের শক্তিপীঠ। মাথায় মুকুট ও কিরীট। গলায় অপরূপ সুন্দর একটি হার। রত্নখচিত গোট, বাজুবন্ধ ও নূপূর। গ্রামদেবী হিসেবে এখনও পুজিত হন এই মহামায়া। তাঁর নামেই মন্দিরের স্থানীয় নাম মহামায়া মন্দির ও সংলগ্ন পুকুরটির নাম মহামায়া পুষ্করিণী। তবে পুজোর ঠ্যালায় রঙিন কাপড় আর গাঁদা ফুলের স্তুপের আড়ালে এই দেবী মূর্তিকে দেখা একেবারে অসম্ভব। তাই কৌতূহল রয়েই যায়। মহামায়ার আড়ালে চাপা পড়েছেন দেবী রতিও। কাপড় একটু সরিয়ে সেই মূর্তিটি দেখান পূজারী।

মন্দিরের নিচের অংশের ষাটটি কুঠুরিতে ষাটটি যোগিনী মূর্তি রয়েছে। বাকি চারটি যোগিনী মূর্তি ও চারটি ভৈরব মূর্তির অবস্থান মন্দিরের কেন্দ্রে একটু উঁচুতে অবস্থিত গোলাকার চণ্ডী মণ্ডপ বা যোগিনী মণ্ডপে। বলা হয় কোনও একসময় এই মণ্ডপে নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি পূজিত হত। কিন্তু এখন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এরমধ্যে ৬১তম যোগিনী সর্বমঙ্গলার কুঠুরিটি ফাঁকা। এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে।

মন্দিরের বাইরে দরজার দুপাশে দুই দ্বারপাল তো আছেই। ঢোকার গলির দুপাশেও দুটি পুরুষ মূর্তিও রয়েছে। আর মন্দিরের বাইরের গায়ে রয়েছে নয় কাত্যায়ণী। এই পরিচারিকারাও মন্দির রক্ষা করছেন। উচিত ছিল বাইরেটা দেখে নিয়ে ভেতরে ঢোকা। কিন্তু মন্দিরের পাথরগুলো রোদে এমন তেতে ছিল যে প্রায় এক্কাদোক্কা খেলার ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। বারদুয়েক মূর্তি চিনতে চিনতে খালি পা অনেকটাই গরম সয়ে ফেলল। অতএব গলি দিয়ে বেরোতে যাই। পূজারিকে সঙ্গে নিয়েই বেরোই। গলির মধ্যে ভয়ঙ্কর দেখতে পুরুষ মূর্তিদুটি কারা জানতে চাই তাঁর কাছে। আমার বাম হাতে অর্থাৎ ঢোকার সময়ে ডান হাতের মূর্তিটি কাল ভৈরবের। আর অন্যটি বৈকাল ভৈরব। দুজনেরই কঙ্কালসার চেহারা, মাথায় জট পাকানো চুল আর লড়াকু ভঙ্গী। কাল ভৈরবের ডান হাতে একটি কাপালা আর বৈকাল ভৈরবের বাম হাতে একটি নরমুণ্ড। কাল ভৈরবের মূর্তির স্তম্ভমূলে একটি ফুলগাছ, একটি শেয়াল আর কাটারি ও কাপালা হাতে দুজন পরিচারক। বৈকাল ভৈরবের পরিচারক দুজনের মধ্যে একজন রক্তপানে ব্যস্ত আর আরেকজনের দুহাতে দুটি কাপালা। মন্দিরে ঢোকার দরজার দুপাশে দুই পুরুষ দ্বারপাল। দুজনেরই দুই হাত এবং স্তম্ভমূলে পদ্মলতা। দক্ষিণের দ্বারপালের কানে অলংকার। উত্তরের দ্বারপালের একটু মোটাসোটা রাগী চেহারা। বাঁ হাতে একটি কাপালা। এবারে নব কাত্যায়ণীদের দেখি ঠা ঠা রোদ্দুর সইয়ে সইয়ে। হালকা হলুদ রঙের বালিপাথরে মূর্তিগুলি আড়াই থেকে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত লম্বায়। অধিকাংশেরই দুই হাত আর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছিন্ন নরমুণ্ডের ওপরে।

ফেরার পথে পিপলির রাস্তার ধারের ঝলমলে রঙিন দোকানগুলি থেকে অ্যাপ্লিকের কাজ করা কয়েকটা ব্যাগ কেনা হল। সবশেষে পৌঁছালাম পটচিত্রশিল্পখ্যাত ছবির মতো গ্রাম রঘুরাজপুরে। তখন মধ্যদুপুর, মা আর ঊর্জা দুজনেই খুব ক্লান্ত। আমরাও কমবেশি। ওরা গাড়িতেই বসে রইল।

রঘুরাজপুর খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে পটচিত্রশিল্পের জন্য খ্যাত। এখানকার শিল্পীরা বংশানুক্রমে এই কাজ করে আসছেন। পাশাপাশি গোটিপুয়া নৃত্যশিল্পের জন্যও এর নাম রয়েছে। যা বর্তমান ওড়িশি নৃত্যের পূর্বসূরী। খ্যাতনামা ওড়িশি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মস্থানও। পুরীর থেকে চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে মাত্র একশো কুড়ি ঘর বাসিন্দাদের তাল, নারকোল গাছে ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামটাতে ঢুকতেই প্রথমেই যেটা পড়ল তা হল রাস্তার দুধারে প্রতিটা বাড়ির বাইরের দেওয়ালে অসাধারণ সব ছবি আঁকা। কোথাও শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনির নানান দৃশ্য, কোথাও হনুমান, কোথাও গণেশ, কোথাও বা সুন্দর সুন্দর নকশা। ঢুকলাম একটা বাড়ির ভেতরে।

বাড়ির প্রথম ঘরটাই শিল্পীর স্টুডিয়ো, বেশ বড়ো একটা হলঘর। একটা ছোট গ্রামে, একটা অতি সাধারণ বাড়ির ভেতর যে অসাধারণ সমস্ত চিত্র রয়েছে তা কল্পনার অতীত। শিল্পী এর ইতিহাস, নির্মাণ পদ্ধতি সব জানালেন। পট্ট অর্থাৎ বস্ত্র এবং চিত্র অর্থাৎ ছবি, সোজা কথায় পটচিত্র কাপড়ের ওপর আঁকা ছবি। পুরীতে জগন্নাথদেবের প্রধান দুটো উৎসব হল স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা। স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে একশো আট ঘড়ার জলে স্নান করানো হয়। এর ফলে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। আবার রথযাত্রার সময় তাঁরা মাসির বাড়ি যান, তখনও মন্দিরে থাকেন না। এই সময় সর্বসাধারণের দর্শনের জন্যে জগন্নাথদেবের পরিধেয় বস্ত্রের ওপর তাঁদের তিন ভাই বোনের ছবি আঁকার প্রচলন হয়, কালক্রমে যা পটচিত্র নামে বিখ্যাত হয়।

পটচিত্র আঁকা হয় তসর বা অন্য কোনো কাপড়ে। প্রথমে কাপড়ের টুকরোর ওপর তেঁতুলের বিচির আঠার প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে দুটো কাপড়ের টুকরোকে একসঙ্গে জোড়াও হয়। এরপর শুরু হয় আঁকার কাজ। পটচিত্র আঁকার জন্যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহৃত হয়, এটাই এর বৈশিষ্ট্য। যেমন শাঁখের গুঁড়ো থেকে সাদা রঙ, কেরোসিন তেলের ল্যাম্পের ওপর টিনের প্লেট রেখে তাতে পড়া কালি থেকে কালো রঙ, তাছাড়া আরও নানা রকম পাথরের গুঁড়ো থেকে অন্যান্য রঙ। শাকসবজি থেকে তৈরি রঙও এঁরা ব্যবহার করেন। পটচিত্রে আঁকার বিষয়বস্তু জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ছাড়াও বিষ্ণুর দশাবতার, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের নানান ঘটনা।

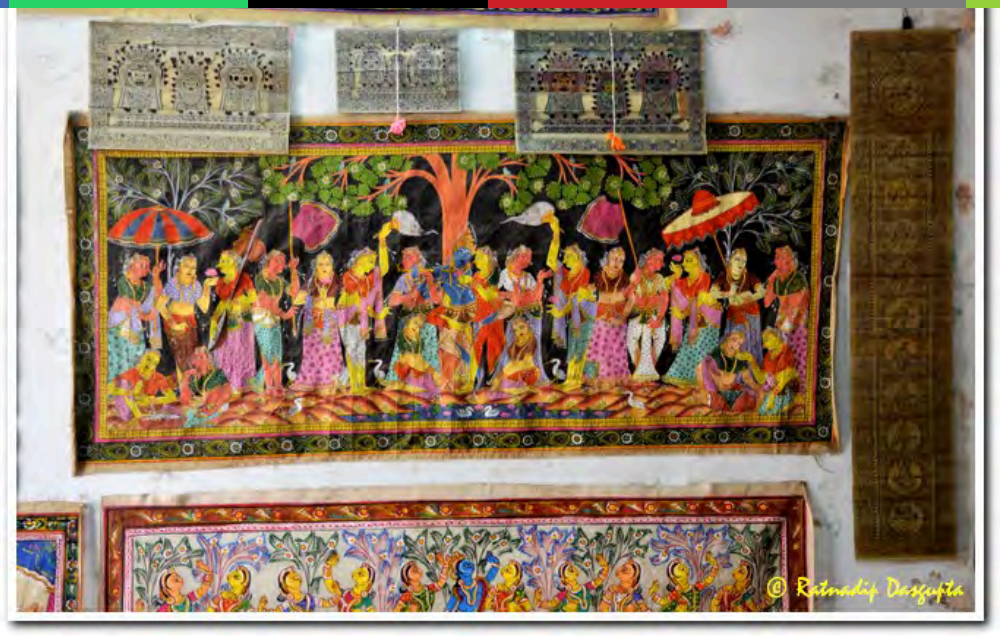

পটচিত্রের আকার বিভিন্ন রকমের হয় – কখনো বড়ো, কখনো ছোটো, কখনো বা সরু লম্বা এক ফালি কাপড়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যা চোখ টানে তা হল এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ এবং উজ্জ্বল রঙ। রামায়ণ, মহাভারতের নানান ঘটনা যেন এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। কাপড়ের ওপর ছাড়াও শুকনো তালপাতার ওপর আঁকা হয়। তালপাতার ওপর প্রধানত কালো কালি দিয়েই আঁকা হয়। এর জন্যে ব্যবহৃত হয় লোহার পেন। শুকনো তালপাতার সরু সরু ফালি সুতো দিয়ে জুড়ে তার ওপর আঁকা হয়, আবার তা ভাঁজে ভাঁজে মুড়েও ফেলা যায়। ছোট্ট ছোট্ট তালপাতার ওপর কী নিখুঁত আঁকা তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বহুকালের পুরোনো পটচিত্রও আজও সমান উজ্জ্বল রয়েছে।

রঘুরাজপুরের হস্তশিল্পের আরো সুন্দর সুন্দর নমুনা আছে। নারকোল ছোবড়া, নারকেলের মালা, সুপুরি প্রভৃতি দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করা হয়। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি করে দলের বয়স্কতমা ও কণিষ্ঠতমা দুজনই বেশ ক্লান্ত, হাতে সময় কম থাকায় গোটা গ্রাম ঘুরে দেখা হল না। আবার আসিব ফিরে... একথা ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

পরেরদিন সকালে উর্জা এবং তার দিদিয়া দুজনেই ঝলমলে জ্বিনপরানো উটের পিঠে চড়ল। আমার পশুপ্রেমী কন্যা উটের মুখ বাঁধা দেখে খুব দুঃখ পাচ্ছিল। প্রশ্ন করে উটওলাদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া গেল যে না হলে উট নাকি কামড়ে দিতে পারে! ভারী আশ্চর্য হলাম আমরা। ইতিমধ্যে লাদাখ আর রাজস্থানে উটের পিঠে আমরা সকলেই চড়েছি। কিন্তু তারা যদি সেখানে না কামড়ায় তাহলে খামোখা এখানে কামড়াবে কেন!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার –
১) কলিঙ্গের দেবদেউল – নারায়ণ সান্যাল
২) Sixty Four Yogini Temple Hirapur - Suresh Balabataray

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেছেন। বর্তমানে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি স্বাধীন গবেষণায় রত। তাঁর সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি পুরোনো ও নতুন ভ্রমণকাহিনির বই প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজ – আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত - ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা (চার খণ্ড)। ভালোবাসেন বই পড়তে, গান শুনতে, লেখালেখি করতে আর বেড়াতে।

পত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক

মৃণাল মণ্ডল

~ *কেদারনাথ যাত্রার আরও ছবি* ~

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

জয়বাবা কেদারনাথ...

কেদারযাত্রার জন্য সোনপ্রয়াগে রেজিস্ট্রেশান করাতে হয়। সেটা আগেই সেরে নিয়েছিলাম। তাই গৌরীকুণ্ডের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে যাত্রা শুরু করে দিলাম। যাত্রা শুরু করতেই সাড়ে ন'টা-দশটা বেজে গিয়েছিল। তাই প্রাতরাশটা আমরা গৌরীকুণ্ডেই সারলাম। আগেই বলেছি গোটা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটারের কম বেশি। যা ২০১৩ সালের সেই বন্যার আগে ছিল ১৬ কিলোমিটারের কাছাকাছি। আর রাস্তা আগের তুলনায় অনেক বেশি খাড়াই। আমরা এখানে এসেছি গোমুখ অভিযান সেরে। তাই শরীর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, খরস্রোতা মন্দাকিনীকে ডানদিকে সঙ্গী করে এগিয়ে চললাম ঢালাই করা খাড়াই পথে কেদারনাথ দর্শনে।

এমনিতে গতরাতে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়েছে। আর আজকের দিনটাও মেঘাচ্ছন্ন। থেকে থেকেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে ভারী রেনকোট আছে। আর আছে গঙ্গোত্রী বাজার থেকে কেনা পাতলা বর্ষাতি। কিছুটা ওঠার পরেই বামদিকে খচ্চরের স্ট্যাণ্ড। কেউ যদি মনস্থির করেন যে খচ্চরের পিঠে উঠে কেদার পৌঁছাবেন, তাঁরা এখান থেকে ভাড়া নিতে পারেন। একমুখী বা উভমুখী দুইধরণের যাত্রার জন্যই খচ্চরের ব্যবস্থা আছে এখানে। পাশে বোর্ডে ভাড়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া আছে। তা নিয়ে যদিও দর কষাকষি চলে। তবে খচ্চর কিন্তু কেদারনাথ বেসক্যাম্প অবধি পৌঁছে দেবে বাকি দেড়-দু কিমি পথ পায়ে হেঁটেই পৌঁছতে হবে। আর হেলিকপ্টারে পৌঁছনোর কথা তো আগেই বলেছি।

এখানে একটা বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার কথা বলে রাখি। গোটা রাস্তাটা বর্ষার কারণে ভিজে আর কাদায় মাখামাখি। তার ওপর পুরো পথ জুড়ে খচ্চরের পটির তীব্র গন্ধ নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল পথের বাঁকে হঠাৎ আগত খচ্চরের বিচিত্র দোদুল্যমান গতি। আমরা যে পায়ে হেঁটেই উঠব সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'জয় ভোলেনাথ' বলে এগিয়ে চললাম। দলের সদস্যরা আগু-পিছু করে চলতে লাগল। কোনো তাড়া নেই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

খচ্চর স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনা স্বাগত জানাল। সেই জলে হাত-মুখ ধুয়ে এগিয়ে চললাম। একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। যাতে লেখা জঙ্গলচটি দেড় কিমি আর ভৈরব মন্দির আধা কিমি দূরে। তবে এই বোর্ড বন্যার আগে লাগানো নাকি পরে সেটা জানার অবকাশ বা ইচ্ছে কোনোটাই তখন ছিল না। ভৈরবমন্দির পেরিয়ে জঙ্গলচটি পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। আমরা যে বেশ ঢিমে তালেই চলছি সেটা মালুম হল। রাস্তায় ৫০০ মিটারের মতো দূরত্বে পরপর ধার ঘেঁষে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য লোহার বেঞ্চ পাতা। আর প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার পরপর ছাউনি দেওয়া বিশ্রামাগার। তাই অভিযাত্রীদের যে যথেষ্ট খেয়াল রাখার সুবন্দোবস্ত আছে তা বলাই বাহুল্য।
জঙ্গলচটিতে এসে শুনলাম এখানকার দূরত্ব গৌরীকুণ্ড থেকে ৫ কিমি। তাই সাইনবোর্ড নিয়ে আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা টের পেলাম। এখানে চা-পান সেরে মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। দুপুরের আহার লিঙচোলিতে সারবো বলে মনস্থির করেছি।
কিছুদূর পরপর একটু করে থেমে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। সঙ্গে আমাদের রেশন অর্থাৎ কাজু, কিসমিস, খেজুর ছিল। প্রয়োজনমতো তা একটা দুটো করে খাচ্ছিলাম। আর অল্প জল। ট্রেক করার সময় একসঙ্গে অনেকটা জল একেবারেই খেতে নেই। এভাবেই চলতে চলতে ভিমবালিতে এসে পৌঁছলাম। এখানে বিশ্রামাগার, থাকার ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে, গাঢ়োয়াল বিকাশনিগমের উদ্যোগে। কারও যদি বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে কেদারযাত্রার ইচ্ছে থাকে তবে এই সমস্ত জায়গা থাকার জন্য উত্তম। আবার কেউ যদি ভাবেন যে আর হাঁটতে পারছেন না। তবে এখান থেকে প্রিপেড পনি (ঝুড়ির মতো একটা ব্যবস্থা, যার ওপর উঠে বসলে একজন ব্যক্তি পিঠে করে পনি সহ আপনাকে কেদার মন্দির অবধি পৌঁছে দেবে) ভাড়া পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে আপনি তার ভাড়াও পেতে পারেন।

এখান থেকে লিঙচোলি প্রায় পাঁচকিমি। চা-বিস্কুট ও কেক সহযোগে বিশ্রাম সম্পন্ন করে আবার রওনা দিলাম। রাস্তার পাশের মাইলফলক জানান দিল কেদার আর ১১ কিলোমিটার। এই ফলক বন্যার আগের না পরের সেই বিতর্কে আবারও

গেলাম না। ভিমবালি পেরিয়ে একটা ছোট্ট ধাতব সেতু পড়ল। তারপর কিছুটা এগোতেই ঢালু পথে কিছুটা নেমে পড়ল মন্দাকিনী ব্রিজ। এখান থেকেই বর্তমানে কেদার যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তিত হয়েছে। আগের রাস্তা ছিল এতক্ষণ যে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁটছিলাম সেই পাহাড় দিয়েই, সোজা পথ, রামওয়াড়া দিয়ে। ২০১৩ সালের ১৬ জুন মন্দাকিনীর সেই বিধ্বংসী ধ্বংসলীলার, আজ যার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর আর বোল্ডারের ধ্বংসাবশেষরূপে, পরে পরিবর্তিত হয়।

এখনকার রাস্তা মন্দাকিনীর ব্রিজ পেরিয়ে উল্টোদিকের পাহাড় দিয়ে। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে প্রকৃত খাড়াই রাস্তা। যা অনেকাংশে সিঁড়ির ধাপের মত খাড়াই ও ধাপকাটাও বটে। হেলতে দুলতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিশ্রাম নিতে নিতে চলছিলাম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যে ঢালাই পিছল রাস্তায় চলা খচ্চরের খুর পিছলে যাচ্ছিল। একটা বাঁকে তো এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল। একটা খচ্চর তার পিঠে সওয়ার হওয়া মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলাকে টাল সামলাতে না পেরে পিঠ থেকে রাস্তায় ফেলে দিল। নিজেও পড়ল পিছলে। ভদ্রমহিলা কোমরে ভীষণ চোট পেলেন। কাছে থাকা লোকজন তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে তুলল। প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হল তাঁর। আর আমরা এটা ভেবে চমকিত হলাম যে খচ্চর যদি একটু এদিক ওদিক পড়ত, তা হলে কী হত! একহাতের মধ্যেই যে খাড়াই পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়েছে নিচে!

আবার হাঁটা শুরু করলাম। কয়েকজনের মুখে শুনলাম আজই নাকি একটা খচ্চর পিছলে খাদে পড়ে গিয়েছে। শিহরিত হলাম। কিন্তু হাঁটা থামালাম না। আর অবশেষে এসে পৌঁছলাম লিঙচোলি। লিঙচোলিতেও থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে ঘরভাড়া ও টেন্টভাড়া দুইই পাওয়া যায়। জি এম ভি এন-এর কটেজগুলিতে বায়োটয়লেটের (কমোড) ব্যবস্থা আছে। লিঙচোলির উচ্চতা ২৮০০ মিটার। আর এখান থেকে কেদার বেসক্যাম্প ৪ কিমি (যদিও এই দূরত্বের পরিমাপও সন্দেহপ্রকাশের অবকাশ রাখে)।

ঘড়ি জানান দিচ্ছিল বিকেল চারটে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তাই আমরা কেউ আলুর পরোটা, কেউ ম্যাগি সহযোগে আহার সেরে নিলাম। শেষে আর একপ্রস্থ চা সেবন করে আবার আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম। বিকেল যত শেষ হচ্ছে আলো তত কমবে আর ঠান্ডা একটু একটু করে বাড়বে। তাই এবার একটু গা-ঝাড়া দিয়ে চলতে শুরু করলাম। দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কেদারপর্বত হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করল।

এরপরের পথও চড়াই। সেই চড়াই বেয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এগোতে থাকলাম। সূর্য অস্ত গিয়েছে অনেক আগেই। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন ফেলে আসা পথের দিকে চাইলাম তখন মনে হল সত্যিই পর্বতারোহী হয়েছি। সে এক অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য। দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঠে আসছে পেঁজা তুলো মেঘ, যেন আমাদের অনুসরণ করে। ক্যামেরার লেন্সবন্দি হল সেই দৃশ্য। ধীরে ধীরে মেঘ আমাদের ধরে ফেলল। আর পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি দিয়ে গেল। আকাশ আবার গাঢ় নীল হল। বাতাসে ভিজে হিমেল ভাব ছড়িয়ে পড়লো। আর প্রকৃতি ঢেলে দিল তার রূপের পসরা। আমাদের দৃষ্টিসুখের পরিতৃপ্তি দেওয়ার অভিলাষে। দিনের আলো দ্রুত কমে আসতে লাগল। আর পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল ঠান্ডা। আমরাও এগোতে থাকলাম তার সঙ্গে।

রাখীর অনেকদিনের সাধ নাকি প্রচুর বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে বরফ হাতে ধরার। অসীমা আর আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে বহুবার। মনে পড়ে যেবার (২০১৬ সালে) দিব্যেন্দুদের সঙ্গে সিক্ক রুট গিয়েছিলাম, সেবার জুলুকের ওপরের দিকে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট পেরোতেই তীব্র তুষার ঝড় শুরু হয়। আরও ১ কিমি যাওয়ার পর শুরু হয় তীব্র তুষারপাত। এত তুষারপাত শুরু হয় যে গোটা রাস্তা বরফে ঢেকে যায়। গাড়ি আর সামনে এগোনোর উপায় থাকে না। সবাই (দিব্যেন্দু, নিপা, দেবাঞ্জন, রিয়া, রতন আর মৌসুমি ছিল অসীমা আর আমার সঙ্গে) গাড়ি থেকে নেমে পড়ি ওই তীব্র তুষারপাতের মধ্যে। প্রত্যেকের পায়ে ভাড়া করা গামবুট। নেমে দেখি চারিদিক অস্পষ্ট ৩০-৪০ মিটার দূরের পর আর দেখা যাচ্ছে না কিচ্ছু। শুধু সাদা আর সাদা। পাশের পাহাড় গুঁড়ো বরফে ঢেকে। আমাদের পাও প্রায় গোড়ালি অবধি বরফে ঢুকে। গাড়ির চাকায় শেকল পরানোর চেষ্টা হল কিছুক্ষণ যাতে গাড়ির চাকা আর একটু গ্রিপ পায়। আর আমরা এগোতে পারি। কিন্তু গাড়ি আর এগোতে পারেনি। তাই আমরা ওই বরফের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে মজা করে আবার ফিরে গিয়েছিলাম নিচে সোজা রংলি। সেই

অভিযানের অভিজ্ঞতাও পরে সময় পেলে একদিন বলব। যাই হোক রাখীর আশা পূর্ণ হল। রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট হিমবাহ পাওয়া গেল। আর উপরি পাওনা একটা ঝরনা। খানিকক্ষণ সেই হিমবাহ ও ঝরনার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। তারপর আবার এগিয়ে চললাম।

সন্ধ্যা নামল। সেই সঙ্গে বাড়ল ঠান্ডার প্রকোপ। ঠান্ডার জন্যই ক্লান্তি আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হল। সোমাঞ্জন ও অতনু স্রেফ মনের জোরেই এগিয়ে চলতে লাগল। কোনও প্রশংসায় তাই ওদের জন্য কম হত। অন্ধকার গাঢ় হল। আর রাস্তার পাশের টিমটিমে আলো জ্বলে উঠল। সেই হাল্কা আলো অপ্রতুল ছিল। তাই টর্চ জ্বালালাম। কিন্তু মনে হল টর্চ না জ্বালিয়ে হাঁটাটাই ভালো হবে। তাই টর্চ নিভিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখও অভ্যস্ত হয়ে উঠল। পথে এমন দুটো জায়গাও পেরোলাম যেখানে হিমবাহ কেটে মাঝের রাস্তা চলার যোগ্য করা হয়েছে। সেখান দিয়ে পেরোনোর সময় পাশে বরফের দেয়ালের উপস্থিতি অনুভব করলাম হাতের স্পর্শে। রাস্তা ভীষণই পিচ্ছিল ও জায়গায় জায়গায় কর্দমাক্ত। সেসব বাধা তখন ক্লান্তির কাছে তুচ্ছ।

যাই হোক একটা ঝরনা পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরলাম। আবার খানিকটা চড়াই। আবার একটা বাঁক। আলো ঝলমলে কেদার বেসক্যাম্প দেখা যাচ্ছিল। সবাই মনকে এই আশা দিচ্ছিলাম যে আর তো মাত্র একটুখানি যেতে হবে। সেই একটুখানি পথও আমরা পেরিয়ে অবশেষে কেদার বেসক্যাম্পে উপস্থিত হলাম। তখন ঘড়ির কাঁটা রাত আটটা ছুঁইছুঁই। পাঁচ মিনিটও বিশ্রাম নিইনি সন্দীপদা একটা প্রস্তাব দিল, 'চল এখানে না, কেদারে গিয়েই বিশ্রাম নেব।' সবাই তখন ক্লান্ত, অবসন্ন। কিন্তু সন্দীপদার প্রস্তাবের কাছে হার মানল। আবার হাঁটা শুরু করলাম। অর্থাৎ আরও দেড়-দুকিমি পথ পাড়ি দিতে হবে। শুধু এবারের পথ ততটা চড়াই নয় এটাই যা রক্ষে।

অবশেষে যখন আমরা কেদার পৌঁছলাম তখন রাত নটা। প্রচণ্ড ঠান্ডা তখন। সেই সঙ্গে তুমুল হাওয়ার দাপট। বাকিদের একসঙ্গে এক জায়গায় বিশ্রাম নিতে বলে আমি আর সন্দীপদা এগোলাম টেন্ট বুকিং করতে। এখানে বলে রাখি কেদার মন্দিরের থেকে তিনশো-চারশো মিটার দূরে উঁচু একটা সমতলের ওপর এই জায়গাটা - কয়েকশো ছোট বড় টেন্ট খাটানো। প্রতিটাতে ছয় থেকে বারোজন করে থাকার ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে পাওয়া যায় বালিশ, স্লিপিং ব্যাগ ও কম্বল। আর টেন্টের তলায় পাতা থাকে মোটা ফোম। যাতে তলা থেকে ভেজা মাটির স্পর্শ না পাওয়া যায়। আর বাথরুম বলতে বাইরে অস্থায়ী কমন টয়লেট। সবই প্রিপেড সিস্টেমে ভাড়া করতে হয় নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে। এছাড়াও অন্য ব্যবস্থাও আছে। সেটা মন্দিরের আর একটু কাছাকাছি। হেলিপ্যাডের কাছাকাছি জি এম ভি এন-এর ছোটো ছোটো একতলা বা দুতলা কাঠের কটেজ আছে। তবে সংখ্যায় অপ্রতুল। আর সেগুলোকে অনলাইন বা আগে থেকে ভাড়া করে রাখতে হয়।

যাই হোক, বুকিং-এর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখি সেখানে দীর্ঘ লাইন পড়েছে। আর সেই সঙ্গে বিশাল জটলা। কথাকাটাকাটি ধাক্কাধাক্কি বেলাইন লাইনভাঙা সবই চলছে পুরোদমে। আমি আর সন্দীপদা দুটো আলাদা লাইনে দাঁড়ালাম। এখানে বলে রাখি, বুকিং-এর জন্য পরিচয়পত্র লাগে। আমরা ভোটারকার্ড বের করে লাইনে দাঁড়ালাম। লাইন যেন আর এগোতেই চায় না। তার উপর বেনিয়ম চলছিলই। বারংবার অভিযোগও হচ্ছিল। সেইসঙ্গে চলছিল লাইনের অসংলগ্নতার জন্য তুমুল ঝগড়াঝাটি। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন বুকিং নেওয়া বন্ধ করতে। কিছুতেই তারা আর বুকিং নেবেন না। শেষে কয়েকজন মিলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা রফাসূত্র বেরোল। আগে ভোটারকার্ড জমা দেওয়া হল। সেই সুযোগে একটু এগোনোও গেল মধ্যস্থতাকারী হিসাবে। তারপর ভোটারকার্ড ধরে নাম ডাকার পর বুকিং হয়ে গেল আটজনের একটা টেন্টে। মিলল কুপন। টেন্টের নাম্বার দেওয়া। ইতিমধ্যে সোমাঞ্জন এসে উপস্থিত সেখানে। ভাইয়ের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। খাওয়ার জায়গায় কুপন কেটে খেতে হয়। মেলে হাতরুটি, পুরি আর দুইরকম ডালসহ ছয়রকম তরকারি। পছন্দ করে নির্দিষ্ট দাম দিয়ে কুপন কাটতে হয়। মেলে খাবার। সোমাঞ্জন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে খেয়ে নিল এর মধ্যেই। আমাদের সঙ্গী অভিজিৎদাও সুযোগ পেয়ে এক ফাঁকে খেয়ে নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্দীপদা, আমি আর সোমঞ্জন মিলে ভাগাভাগি করে নির্দিষ্ট ঘর থেকে স্লিপিং ব্যাগ, কম্বল আর বালিশ সংগ্রহ করে অতনুদের উদ্দেশ্যে এগোলাম। অতনু, অসীমা, রাখী একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা একসঙ্গে হলাম। অভিজিৎদা তখনও বেপাত্তা। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ওই আধো আলোতে আমরা এবার নির্দিষ্ট টেন্ট খুঁজতে লেগে গেলাম। অবশেষে কুপনের নম্বর মিলিয়ে টেন্ট খুঁজে পেলাম।

এবার উপস্থিত হল আরেক বিপত্তি। আমাদের ভাড়া করা টেন্টে অন্য লোক শুয়ে আছে। তারা মোট দশজন। আটজন দিব্যি

গুছিয়ে শুয়ে আছে। পিছনের দিকের দুজন শুয়ে শুয়ে মোবাইলে মুভি দেখছে। প্রথমে বললাম যে এটা তাদের তাঁবু নয়। তাদের কুপনের নম্বর দেখাতে বললাম। কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই। তারা দিব্যি কানে তুলো গুঁজে শুয়েই রইল। একজন শুয়ে শুয়েই কথা বলছিল। তার সঙ্গেই বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলল। কিন্তু তারা ওঠার কোনও উদ্যমই দেখাল না। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হতোদ্যম হয়ে পড়ছিলাম। তাই আর তর্ক না করে সোমাঞ্জন আর আমি আবার বুকিং কাউন্টারে গেলাম। সেখান থেকে বহু কষ্টে একজনকে ডেকে নিয়ে এসে আর একবার চেষ্টা করা হল অনুপ্রবেশকারীদের ওঠানোর। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হল। তখন পাশের একটা ফাঁকা টেন্টে আমাদের নতুন করে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। নতুন টেন্টটা যদিও আগের টেন্টের থেকে নিচু তবুও আর তর্ক বাড়ালাম না। অন্য আরেকটা ফাঁকা টেন্ট থেকে আর একটা ফোম জোগাড় করে আনলাম মেঝেতে পাতার জন্য। তারপর শুরু হল জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার পালা। অভিজিৎদার তখনও দেখা নেই।

এবার আমি মেজাজ হারালাম আর খানিক চোটপাট করে শান্ত হলাম। পরে বুঝেছিলাম এটা বড় ভুল হয়েছিল। কিন্তু ওই সময় এত ঝক্কি আর পরপর এতগুলো পরিস্থিতিবিমুখ ঘটনা পরপর সামলাতে হওয়ায় হয়তো আবেগবশত বেরিয়ে এসেছিল সেই অভিব্যক্তি। যদিও সহযাত্রীদের কেউ তখন বা পরে এই নিয়ে কোনও অভিযোগ করেনি। কিন্তু আজও আমার মনে হয় ওই আচরণের কোনও প্রয়োজন ছিল না। আজ ওই দিনের ভুল স্বীকার করে নিলাম। আর আমার সহযাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই সেদিনের ওই ব্যবহারের পরেও আমাকে কোনও কথা না বলে সহ্য করার জন্য।

আবার কেদারের কথায় ফিরি। অভিজিৎদার দেখা মিলল অবশেষে। সোমাঞ্জন আর অভিজিৎদাকে রেখে আমি, অসীমা, অতনু, রাখী, সন্দীপদা আর অনসূয়া খেতে চলে গেলাম। সবাই পুরির জন্য কুপন কাটলাম। তার সাথে আলুর দম আর ছোলার তরকারি। এক প্লেট পনির মাসালাও চেখে দেখা হল। প্রসঙ্গত বলে রাখি এখানের সব খাবারই নিরামিষ। খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা ঢালের দিকে একটু এগিয়ে দূর থেকে মন্দির দর্শন করলাম। সে এক মোহময়ী পরিবেশ। সমগ্র মন্দির চত্বর জুড়ে আলো আঁধারি খেলা। মন্দিরের গায়ের আলোর চেন যেন মন্দিরের গয়না। আর মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন মূর্তিতে সার্চলাইট পড়ে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। পিছনের দিকে অন্ধকারেও তুষারশুভ্র কৈলাসপর্বত যেন মহাদেবের হাসির মত উদ্ভাস সৃষ্টি করেছে। সে এক শিহরণ জাগানো সৌন্দর্য, যার কাছে যেকোনও উপমাই কম বলে মনে হয়।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। অল্প কিছু গোছানো সেরে যে যার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলাম। পুরুলিয়া অভিযানে অসীমা আর আমি জঙ্গলে রাত কাটিয়েছিলাম। তাঁবুতে আর স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। তাই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তাই অন্যদের (বিশেষ করে সন্দীপদাকে) একটু সাহায্য করলাম সেটা কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয় বলে। পরবর্তীকালে আবার ফোকতে-দারা অভিযানে আবার স্লিপিং ব্যাগ আর তাঁবু ব্যবহার করেছিলাম।

দু-চার কথা বলতে বলতে সবাই ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলাম। তার অন্যতম কারণ ক্লান্তি। আর ছিল বাইরে তীব্র ঠান্ডা। কত তা মাপার উপায় ছিল না। কিন্তু তা যে মাইনাসের দিকে অনেকটাই সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। ভোরে উঠতে পারিনি আর। সকালের কাজ সেরে সবকিছু সঙ্গে নিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। রাতের নিস্তব্ধ মন্দির তখন জনকোলাহলে গমগম করছে। আর পুজো দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন হেলিপ্যাড অবধি চলে গিয়েছে। তাই পুজো দেবনা এটা স্থির করে এগোলাম। কারণ আজই আবার নিচে নেমে চোপতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে।

পঞ্চকেদারের প্রতিটি শিবমন্দির সম্ভবত একই আদলের। কারণ তিন কেদার (কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ ও মদমহেশ্বর) আমরা অভিযান করেছি। সব মন্দিরই বহিরঙ্গে একই। পার্থক্য শুধু ভোলেবাবার রূপে। যে কথা আমি প্রথম পর্বেই উল্লেখ করেছি। কপালে থাকলে আর আটকায় কে! হঠাৎ একজন পুরোহিত মশাই কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হলেন। আর শুদ্ধ বাংলায় আলাপচারি শুরু করলেন। তাঁরই বদান্যতায় আর অনুগ্রহে পুজো দেওয়ার সুযোগও জুটে গেল। সবার হয়ে অসীমা আর রাখী পুজো দিতে গেল তাঁর সঙ্গে, ঘুরপথে। ওরা পুজো দিতে যাওয়ায় আমরাও ফোটোগ্রাফিতে মন দিলাম। আমার মোবাইল ও ক্যামেরা একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিভিন্ন স্মৃতি লেন্সবন্দি করতে। বিভিন্ন দিক থেকে মন্দিরের যত ইচ্ছা ছবি

তুললাম। অন্যরা বেশি সেল্ফি তোলায় মন দিল। নিজের ছবির থেকে সামনের ছবি বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় আমার। চারপাশের পরিবেশকে ধরে রাখার কাজে মনোনিবেশ করলাম। অসীমা আর রাখী ফিরে এলে পুজোর সামগ্রী গুছিয়ে নেওয়া হল। ওদেরও বেশ কিছু ছবি তোলা হল। তারপর মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। মন্দিরের পিছনেই সেই বিশালাকার পাথরের চাঁই, এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। যে পাথর গড়িয়ে এসে এমন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে যায় যে হড়পা বান-এর ফলে ফুঁসতে থাকা মন্দাকিনীর বিপুল জলরাশি দুটি ধারায় ভাগ হয়ে মন্দিরের গা ঘেঁষে দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মন্দিরের ক্ষতি হয় যৎসামান্যই। মন্দির-সংলগ্ন বাকি সবকিছুই জলস্রোতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সবাই এইভাবে মন্দিরের বেঁচে যাওয়ার ঘটনাকে অলৌকিক বলে মানে। আর বলে এ স্বয়ং মহাদেবের লীলা।

বেলা এগারোটা নাগাদ ফেরার জন্য যাত্রা শুরু করলাম। লক্ষ্য ছিল যত দ্রুত নামা যায়। তাই ভোলেনাথকে স্মরণ করে আমরা তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করলাম। পথে সেই হিমবাহ, সেই ঝরনা সবার সঙ্গে আবার দেখা হল। একে একে সবাইকে বিদায় জানিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামতে লাগলাম। আমার নামার গতি অত্যন্ত বেশি। সন্দীপদারও তাই। অনসূয়াও সমান তালে চলল। পুরো দলটা একটু ভেঙে ভেঙে নিজেদের গতি অনুযায়ী নামতে লাগল। পথে আরও একপশলা বৃষ্টি হল। আর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি তো যখন তখন হচ্ছিল। আমি আর অসীমা নিজেদের মত করে শর্টকাট নিচ্ছিলাম। আর আমাদের দেখাদেখি শর্টকাট নিতে গিয়ে অতনু একটা বড় বিপদ ঘটাল। স্লিপ করে গড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা পাথরের গায়ে গিয়ে আটকে গেল। হাত-পা খানিকটা ছড়ে গেল। বিপদ আরও বড় হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ওর বিখ্যাত ভুঁড়িই এযাত্রায় বাঁচিয়ে দিল ওকে। ঘটনাটার উল্লেখ করে অতনু আজও নিজের ভুঁড়ির গুণগান করে।

আর একটু নেমে একজায়গায় একটা পরিচ্ছন্ন বায়োটয়লেট পেয়ে কয়েকজন শান্তিতে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিলাম। তারপর ওই চত্বরের দোকানেই আবার মধ্যাহ্নভোজন সারা হল। অর্থাৎ উদর খালি ও পূর্তি সম্পন্ন করে আবার নামতে লাগলাম। খুব সহজেই গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম। উঠতে যেখানে এগারো ঘন্টার কাছাকাছি লেগেছিল, সেই পথ নামতে আমাদের লাগল সাড়ে তিন ঘন্টার কমবেশি। এর থেকেই কেদারের পথ কতটা খাড়াই তা সহজেই অনুমেয়। যদিও পরবর্তী উত্তরাখণ্ড অভিযানে মদমহেশ্বরের পথ এর থেকেও খাড়া বলে মনে হয়েছিল। সেটা দুবছরের সময়ের পার্থক্যের জন্য মনের ভুল কিনা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না।

গৌরীকুণ্ডে আরেকপ্রস্থ আহার সেরে টাটাসুমো চেপে সোনপ্রয়াগে ফিরলাম। সেখানে মোমিন অপেক্ষা করছিলেন আমাদের গাড়ি নিয়ে। চা পর্ব সেরে আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি রওনা দিল সঙ্গে সঙ্গেই। আর এক অভিযানের উদ্দেশ্যে।

~ সমাপ্ত ~

~ *কেদারনাথ যাত্রার আরও ছবি* ~

হাওড়া জেলার অঙ্কুরহাটি কিবরিয়া গাজি উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক মৃণাল মণ্ডলের নেশা ভ্রমণ, খেলাধূলা ও সাহিত্য চর্চা।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment | Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

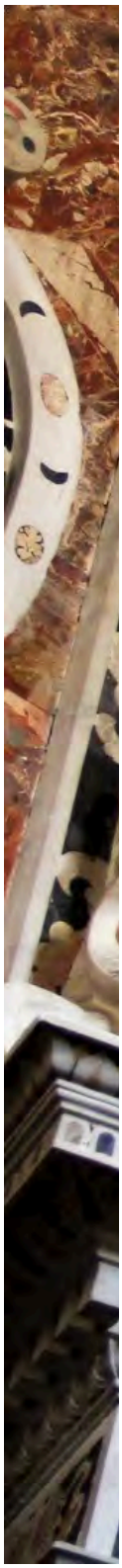

বচিত্র্যময় সিসিলিতে

শ্রাবণী ব্যানার্জী

ইতালির ম্যাপটা দেখলে মনে হয় – একটি বুটজুতো যেন উপেক্ষা ভরে এক ত্রিকোণ পাথরকে পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, সেই তিনকোণা জায়গাটিই আজকের সিসিলি। সবদিক থেকেই এরা যেন সত্যিই দূরে সরে আছে, তাই ইতালিতে থেকেও এরা স্বতন্ত্র। বহু যুগ ধরে নানা জাতি, নানা ভাষা ও নানা ধর্মের সংমিশ্রণে এটি একটি নজিরবিহীন স্থানে পরিণত হয়েছে। বহুবার ইতালি সফরে গেলেও সিসিলি আমার কাছে অধরাই ছিল তাই কয়েক বছর আগে সেদিকেই রওনা হয়েছিলাম।

কয়েক হাজার বছর পেছিয়ে গেলে হয়তো এই সাড়ে বত্রিশ ভাজা দেশটিকে বুঝতে একটু সুবিধা হবে। প্রায় সাতাশশো বছর আগে গ্রিকরা এই সিসিলিতে কলোনি স্থাপন করে আর সেইসূত্রেই জগৎবিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস এখানেই জন্ম গ্রহণ করেন। তারও অনেক আগে পিথাগোরাস-এর মত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ যিনি পিথাগোরিয়ান থিওরেম-এর জন্য খ্যাত, তিনিও এই সিসিলিকেই তার কর্মস্থান হিসাবে বেছে নেন। তারপর প্রাচীন ফোনেসিয়ান (লেবানন) ও কার্থেজ যা কিনা আজকের টিউনেশিয়া তাদের হাত ঘুরে এ দেশটি চলে আসে রোমানদের আওতায়। রোম সাম্রাজ্য পতনের পর বাইজানটাইন বা পূর্ব রোম সাম্রাজ্য কনস্টানটিনোপল থেকে এসে এটিকে দখল করে নেয়। তারপর আসে আরব মুসলমানরা। তারাও বহু বছর রাজত্ব করার পর একে একে নর্মান (আজকের নরওয়ে, ডেনমার্ক) জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশদের হাত ঘুরে আঠারোশো ষাট সালে গ্যারিবল্ডির দাপটে আজকের এই স্বয়ং শাসিত দেশটি ইতালির আওতায় আসে।

রাজধানী পালারমো-তে পা দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই বুঝলাম এটি একটি খিচুড়ি দেশ। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময় রাজত্ব করায় সব কিছু মিলিয়ে এদের একটি নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পালারমোতে রোমান সম্রাট

দেখলাম বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের গায়ে বাংলায় লেখা আছে – এখানে মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যায়। একজন বাংলাদেশিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম শুধু পালারমোতেই নাকি দশ হাজার বাংলাদেশি থাকেন আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা স্কুলও আছে। চারিদিকে এঁদের রমরমা দেখে মনে হল কে জানে আর কিছু বছর পর হয়তো এই দেশটির ভাষার খিচুড়ির সঙ্গে আর এক নতুন উপাদান বাংলাও যুক্ত হয়ে যাবে। তবে তাই বা খারাপ কি বলুন, কথাতেই তো আছে – অধিকন্তু ন দোষায়।

দেশটি মাফিয়াদেরও পীঠস্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ ইতালির বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য এই গুণ্ডা মাফিয়াদের সহায়তা নিতে বাধ্য হয় আর তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তারা ফুর্তির সাথে কোকেন হেরোইনের ব্যবসা চালাতে থাকে। ঝামেলা হয় যখন টুরিস্টরা 'গড ফাদার' সিনেমাটি দর্শন করে মনে করেন নেপলস বা সিসিলিতে গেলে ওঁদের হোটেলের বিছানাতেই বোধহয় কেউ ঘোড়ার কাটা মুন্ডু রেখে যাবে। অনেকে আবার জিজ্ঞাসা করে বসেন – আচ্ছা ঠিক কোথায় গেলে ওই বদমাইশ মাফিয়াগুলোর দর্শন পাব বলুন তো? কী জ্বালা! এই মাফিয়াদের তো রাবণের মত কোনও বাড়তি মাথা নেই যে দেখলেই বুঝবেন। রেস্টুরেন্টে আপনার পাশে বসেই হয়তো কোনও মাফিয়া গ্যাং-এর লোক আরাম করে খাচ্ছে আর আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন – একটু মাফিয়াদের দেখিয়ে দিতে পারেন? যেমন আমি ছোটোবেলায় মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – মা চোর কেমন দেখতে হয় একটু বলবে?

পালারমো জায়গাটিতে মস্ক, প্যালেস, ক্যাথিড্রাল প্রায় সবাই হাত ধরাধরি করেই চলাফেরা করে। হাল্কা বাদামি রংয়ের বিরাট ক্যাথিড্রালটা বাইরে থেকেই তার অপূর্ব আর্চ, উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত ম্যুরিশদের অসাধারণ জ্যামিতিক নকশা ও ক্লক টাওয়ার নিয়ে এতটাই সুন্দর যে মনে হল এখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। ভেতরে ঢুকে দেখলাম সোনালি রঙের অসাধারণ সব শিল্পকর্ম, মোজাইক, ভাস্কর্য, কোষাগার আর ঝকঝকে রত্ন সম্ভার নিয়ে সেও এককথায় বড় সুন্দর। বাইজানটাইন ও মুসলমানদের মিলিত প্রভাব থাকায় এটাও এক ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট।

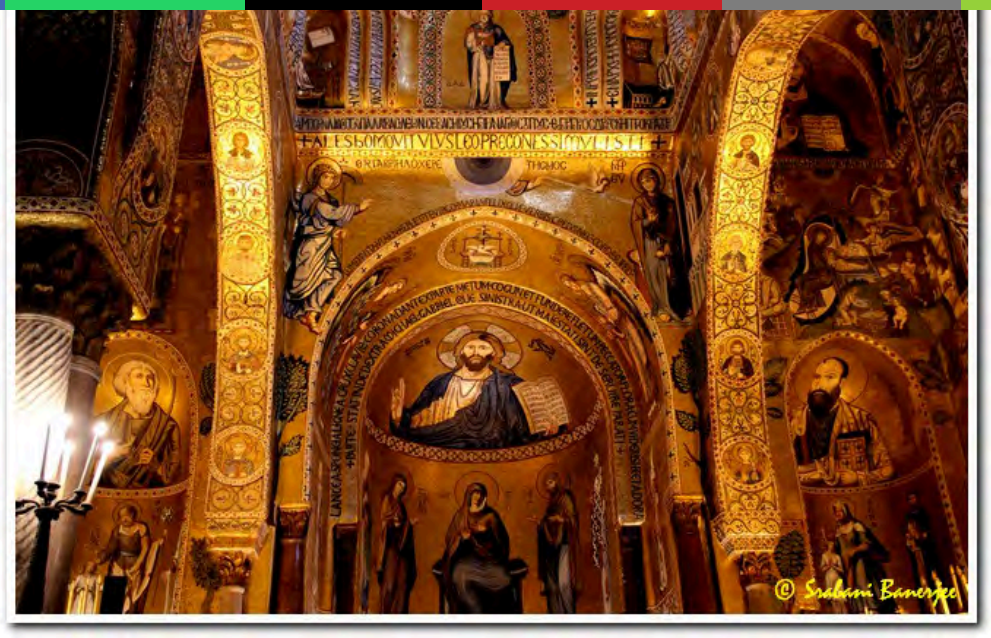

নর্মান প্যালেসে ঢুকে বুঝলাম সেটাও কম চমকপ্রদ নয়। হাজার বাহাত্তর অর্থাৎ ইংল্যান্ড জয় করার মাত্র ছবছর পরেই উত্তর ইউরোপ থেকে আগত নর্মানরা সিসিলি দখল করে নেয়। প্যালেসের থেকেও চোখ কাড়ল তার গায়ে লাগানো প্যালাটাইন চ্যাপেল। বাইজান্টাইন, নর্মান ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা ইসলামিক ফতিমিড অর্থাৎ এই ত্রিসংস্কৃতির সংমিশ্রণে যা তৈরি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে নজর কাড়ার মতো। মোজাইক, চারিদিকে কারুকার্যময় সূক্ষ্ম কাঠের কাজ, যিশু-সহ প্রতিটি দেয়ালে সোনালি পেইন্টিং আর সবথেকে আকর্ষণীয় মুসলমানদের তৈরি ধনুকাকৃতি ছাদে হানিকম্ব বা মৌচাকের মত দেখতে মুকার্নাস। নর্মান রাজাদের সব জাত ধর্মের প্রতি সহনশীলতার এ যেন এক চমৎকার নিদর্শন। এই দেশে এসে বুঝেছিলাম খিচুড়ি সংস্কৃতিও কিছুমাত্র কম আকর্ষণীয় নয়।

একসময় হাঁটতে হাঁটতে পৌছে গেলাম পালেরমোর ঐতিহাসিক কেন্দ্রবিন্দু 'কোয়ারতোকান্তিতে' যা কিনা বাংলায় চার মাথার মোড়। সেখানেও দেখলাম দুধারের বাড়ির জানলাগুলো মূর্তি দিয়ে সাজানো। এর পাশেই পিয়াজা প্রেতোরিয়া যার মধ্যখানে ফোয়ারা আর চারিদিকে প্রায় ষোলোটা মার্বেলের স্ট্যাচু নিয়ে সেও এক বিরাট চত্বর। তার মধ্যে গ্রিক মিথলজি অর্থাৎ তাদের দেবতা আপোলো, পোসাইডন ও জিউস যা কিনা আমাদের সূর্য, বরুণ ও ইন্দ্র তাঁদের মূর্তিগুলো চিনতে কোনও অসুবিধাই হল না। পালেরমো স্ট্রিটফুডের খুব নাম শুনেছিলাম কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে বিভিন্ন জানোয়ারের মুন্ডু থেকে হৃৎপিন্ড ও পিলে স্যান্ডউইচের সম্ভার দেখে সব খিদে কর্পূরের মতই উবে গেল। তার থেকে বেজায় মোটা চতুষ্কোণ সিসিলিয়ান পিৎজা ঢের বেশি নিরাপদ। তাছাড়া এদেশের স্পেশ্যালিটি ভেতরে কুচো মাংস দেওয়া বোমার সাইজের ভাতের গোলা ভাজা 'আরাণচিনি' যদি পেটে কয়েকটা চালান করে দিতে পারেন তাহলে একেবারে বহুক্ষণের জন্য খিদের হাত থেকে নিশ্চিন্ত। সিসিলিয়ান খাবারগুলোও আরবি, মেডিটেরেনিয়ন আর আফ্রিকানের সংমিশ্রণে বহুদিন ধরেই ফিউশন। বহু খাবারেই বেগুনভাজার ছড়াছড়ি যেমন 'কাপানাতা' খেয়ে দেখলাম গোল গোল করে কাটা বেগুনভাজার সঙ্গে আরও

বিকেলে রাস্তার ধারে দেখবেন লোকজন বিয়ারের সাথে 'পানেলে' অর্থাৎ ছোলা আর ময়দা দিয়ে মাখা ভাজা কাটলেট জাতীয় কিছু একটা খেয়ে যাচ্ছে। সিসিলির আবিষ্কার 'কেনোলি' যা কিনা ভেতরে ক্রিমঢোকানো পাইপের মত পেস্ট্রি তারও আবার বাইরেটা ভাজা। প্রখর হজমশক্তি থাকলে ভাজা খাবার দিব্যি মুচমুচে ও উপাদেয় লাগে আর এব্যাপারে গুজরাটিরাও সিসিলিয়ানদের কাছে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করতে পারে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার এসব খেয়েও এরা কিন্তু কেউ মোটা নয় হয়তোবা সেটা সারাদিন উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাচলা করার ফল। আমাদের হোটেলটা পিয়াজা ভার্গয়েব-এর পাশেই থাকায় ইতালির সবথেকে বড় 'মাসিমো' অপেরা হাউজটিকেও দেখতে পেলাম। বিশাল চত্বরটিতে লোকজন ফুর্তিতে খাওয়াদাওয়া করছে আর বাংলাদেশি হকাররা খেলনা থেকে বেলুন ফানুস সবই বিক্রি করে যাচ্ছে। এসব তল্লাটে বাংলায় ঝগড়া করা কিন্তু আদৌ সুবিধার নয়, বরং ইংরাজি ঢের বেশি নিরাপদ।

পালেরমোর শহুরে পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আমরা পরেরদিন একসময় চলে গিয়েছিলাম 'মনরিআলে' আর 'চেফালু'-তে কারণ গন্তব্যস্থানগুলো কাছেই থাকায় বাসে করে পৌঁছে যাওয়া যায়। বারোশো খ্রিস্টাব্দে নর্মান রাজা দ্বিতীয় উইলিয়াম-এর উদ্যোগে তৈরি ক্যাথিড্রালটিতে ঢুকে মনে হল সৌন্দর্যে এ যেন তার ঠাকুর্দা (যিনি পালেরমো ক্যাথিড্রাল করেছিলেন) তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এদেশে এরকম এত ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট আছে যে আলাদা করে হয়তো সত্যিই বলার কিছু নেই। ভেতরে সারা দেয়াল জুড়ে সোনালি মোজাইক আর অপূর্ব সুন্দর যিশুকে দেখে মনটা যেন ভরে গেল। পুরো ডিজাইনটাই মুসলমান আর্কিটেক্টকে দিয়ে করানোর ফলে ভেতরের ফোয়ারা থেকে সুন্দর স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা আঙিনা, সবেতেই ইসলামিক ছাপ খুব স্পষ্ট।

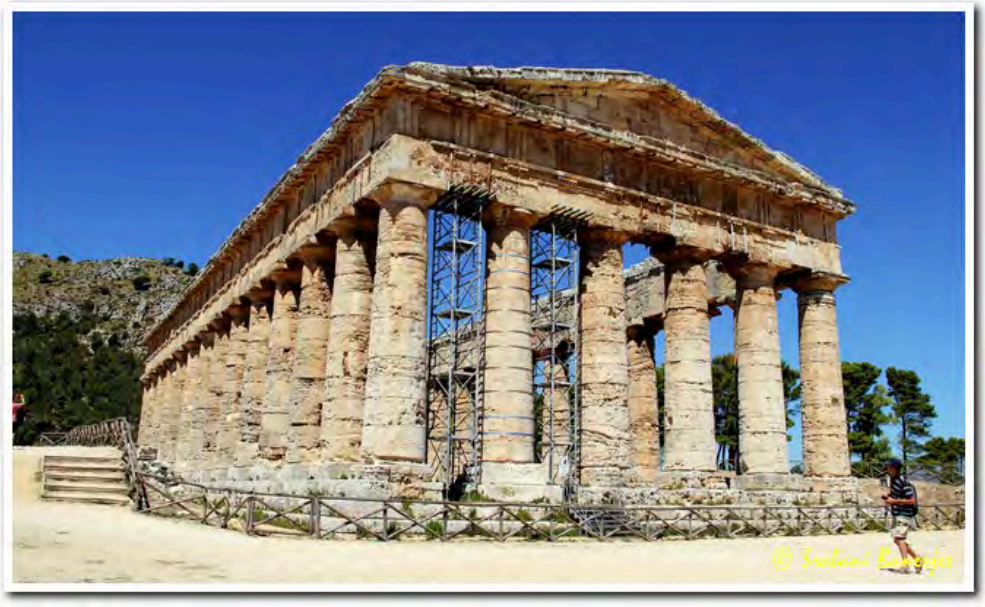

দেখতে। খাড়া টিলাতে উঠতে গিয়ে বেশ একটু হাঁপিয়ে গেলাম, কাছে গিয়ে বুঝলাম কোনও কারণে এরা মন্দিরের ভেতরটি কোনোদিনই শেষ করেনি যদিও বাইরেটা সুন্দরভাবেই রাখা আছে। রুক্ষ শুষ্ক জায়গা তবু তারও একটা সৌন্দর্য আছে।

গ্রিকরা অবশ্য প্রায় সব মন্দিরই উচ্চস্থান দেখে করত যাতে লোকজনকে হাঁপাতে হাঁপাতে রীতিমতো কষ্ট করেই ভগবানের দর্শন পেতে হয় – ভগবানরা খুব সহজলভ্য হয়ে গেলে আমজনতার কাছে তাঁদের বিশেষ মূল্য থাকে না।

'সেজেশতা' থেকে আরও প্রায় ঘন্টা দেড়েক গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেলাম সিসিলির দক্ষিণে 'এগ্রিজেনতো'-র ভ্যালি অফ টেম্পল-এ অর্থাৎ আড়াই হাজার বছরের পুরোনো মন্দির উপত্যকায়। এ যেন আমার কাছে এক বিস্ময়! টেম্পল অফ জিউস, মাউন্ট অলিম্পাস-এর রানি 'হেরা'বা শক্তিশালী 'হারকিউলিস'-এর মন্দিরগুলি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেলেও 'কনকরডিয়া'মন্দিরটি এতটাই সুন্দর রয়েছে যে দেখে মনেই হয় না এর বয়েস আড়াই হাজার বছর। এ তল্লাটের লোকজন প্রাচীন কার্থেজ অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার টিউনেশিয়ার সৈন্যদের হারিয়ে এই সুন্দর মন্দিরটি তৈরি করে। গ্রিসে দেখেছি সব মন্দির বা ঐতিহাসিক জায়গাই হয় ভূমিকম্প নয়তো বা বহিরাগতদের আক্রমণে প্রায় ধ্বংসস্তূপ, তাই এদেশে এই সুন্দরভাবে সংরক্ষিত মন্দিরটি দেখলে সত্যিই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। নববিবাহিতরা দেখলাম মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কায়দায় সব ছবি তুলছে। সে রাতটা এখানকার হোটেলেই কাটিয়ে দিলাম আর দূরে থাকলেও উঁচুতে আলো দিয়ে সাজানো সুন্দর মন্দিরটি যেন আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেল।

পরেরদিন সকালে উঠে চলে গেলাম পিয়াজা আর্মেনিয়াতে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ সতেরোশো বছরের পুরোনো একটি রোমান ভিলা। এই সাড়ে তিন হাজার স্কোয়ার মিটার জুড়ে ভিলাটি নি:সন্দেহে কোনও অভিজাত পরিবারের বাসস্থান ছিল কিন্তু সব থেকে নজর কাড়ে সারা মেঝে জুড়ে অসাধারণ মোজাইকের কাজ। বারোশো শতকে পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে পুরো ভিলাটাই মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়, বছর পঞ্চাশ আগে যখন মাটি খুঁড়ে এটিকে বার করা হয়, লোকজন এই অসাধারণ সংরক্ষিত মোজাইক দেখে তাজ্জব হয়ে যায়।

কাঠের পাটাতন দিয়ে উঠে বিরাট হলঘরের মেঝেটার দিকে তাকিয়ে মনে হল কী ভাগ্যিস মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল তাই তো এত সুন্দরভাবে সংরক্ষিত আছে। কোথাও দেখলাম লোকজন শিকার করতে যাচ্ছে, কোথাওবা যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের ভাবভঙ্গি আর কোথাও বিকিনি পরা সুন্দরীদের খেলা। ছোট ছোট পাথর দিয়ে মেঝেটিতে বসানো বিভিন্ন বিকিনির ডিজাইনও কিন্তু চোখে পড়ার মত, অনেকক্ষেত্রে আধুনিক যুগের বাড়া।

মধ্যিখানের উঠোনে সুন্দর কারুকার্যময় ফোয়ারা, অপূর্ব মোজাইক ও রোমান বাথ নিয়ে এই সতেরোশো বছরের পুরোনো ভিলাটি দেখলে রোমানরা যে কতটা সৌন্দর্যপ্রিয় জাত ছিল সেটা নতুন করে বলে দিতে হয় না।

এখান থেকে 'রাগুসা' আর 'নোটো' নামক দুটো জায়গায় কয়েকঘণ্টা থেমে রাতে পৌঁছে গিয়েছিলাম সাইরাকিউস আর তার গা ঘেঁষে ছোট্ট দ্বীপ 'ওরটিজিয়া' – সেখানেই ছিল আমাদের হোটেল। 'রাগুসা'-র পাথুরে রাস্তা আর আশপাশ দেখে মনে হল এরা যেন সেই মধ্যযুগীয় সময়েই থেমে আছে অবশ্য তার আকর্ষণও কিছুমাত্র কম নয়। যারা বারোক স্টাইল দেখতে ভালবাসেন, তারা এখানকার 'সানজর্জিও ডুওমো'টা দেখলে দারুণ খুশি হবেন। 'নোটো'-তে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, চারিদিকে হাল্কা নীল রংয়ের আলোতে সাজানো জায়গাটিতে ঢুকে মনে হল যেন কোনও স্বপ্নপুরীর দেশ। সব থেকে চোখ কাড়ে বারোক স্টাইলের চার্চ আর পাথরে বাঁধানো রাস্তাগুলির ধারে ধারে আর্টিস্টদের তৈরি অসাধারণ ছবির পসরা।

চারশো বছর আগে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেলে জায়গাটিকে আবার নতুন করে সাজানো হয়। হালকা রংয়ের চুনা পাথরের তৈরি পিয়াজা দুসেজিওতে দাঁড়ালে চোখে পড়ে আলোয় ঘেরা টাউনহল আর বিশপ প্যালেস।

রাতে সেজে ওঠা সুন্দর স্থাপত্যশিল্প মোহিত হয়ে দেখতে দেখতে কেন জানি না হঠাৎ করেই বেজায় খিদে পেয়ে গেল। কালবিলম্ব না করে একটি পিৎজার দোকানে ঢুকে খুব তাড়াতাড়ি দাও বোঝাতে প্রতিটি ইংরাজি শব্দের পেছনে ওকার যোগ করে – ক্যুইকো, প্রমতো, স্পিডো, ফাস্টো প্রভৃতি প্রচন্ড বেগে আউড়ে গেলাম। লোকটা আমার ইতালিয়ানের বহর দেখে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে 'নো প্রব্লেমো' বলে একটি তৈরি পিৎজাই হাতে ধরিয়ে দিল। খাওয়া সেরে আরও আধঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে সে রাতেই ওরতিজিয়া পৌঁছে গেলাম।

দুহাজার সাতশো বছর আগে সাইরাকিউস ও তার সংলগ্ন ছোট্ট দ্বীপ ওরতিজিয়া ছিল এক অসাধারণ গ্রিক কলোনি। রোমান রাষ্ট্রনায়ক ও দার্শনিক সিসেরো-র 'The biggest and most beautiful of all Greek cities' – উক্তিটা এতো বছর পরেও একইভাবে খাটে। একাধারে আড়াই হাজার বছরের পুরোনো গ্রীক থিয়েটার, গ্রীক দেবতা আপেলো ও মিনার্ভার টেম্পল, সুন্দর সাজানো মধ্যযুগীয় চার্চ, পাহাড়, নীল সমুদ্র ও দুর্গ নিয়ে আজও জায়গাটা ভারী সুন্দর। রাতে সাদা পাথরের রাস্তায় হাল্কা হলুদ আলোর ছটায় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো পিয়াজা ডুওমোতে দাঁড়ালে মনটা যেন এক অন্য জগতে চলে যায়। লোকজন দেখলাম হালকা আলোয় রাস্তাতেই খাওয়াদাওয়া করছে।

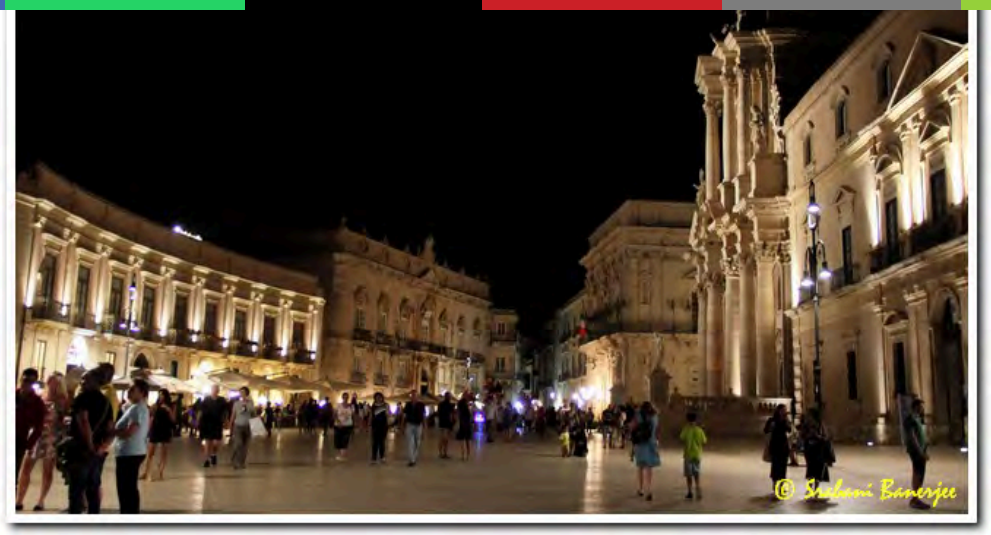

এখানে রয়েছে এক অপূর্ব সুন্দর ক্যাথিড্রাল যা কিনা একদা গ্রিক দেবী এথেনার মন্দিরের ওপরেই তৈরি করা হয়েছিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে আশেপাশে এখনও সেই আড়াই হাজার বছরের পুরোনো গ্রীক ডরিক স্তম্ভগুলো দেখতে পাওয়া যায়। বারোশো বছর আগে তখনকার শাসক বাইজানটাইনরা আরব আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সাগরের ধার দিয়ে একটি বিশাল দুর্গ বানায় যা কিনা আজও একইভাবে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। তাকিয়ে দেখলাম নীল স্বচ্ছ সমুদ্রের জলে মাছ ও মানুষ উভয়েই সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

আমাদের হোটেলটা ছিল আর্কেমিডিস স্কোয়ারের ওপরেই, বারান্দা থেকেই দেখতে পেলাম ফোয়ারাসহ অপূর্ব সুন্দর রোমান দেবতা ডায়ানার মূর্তি। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এরই আশেপাশে সেই অসাধারণ পন্ডিত আর্কিমিডিস থাকতেন। মনে হল রাস্তা থেকে যদি তেইশশো বছর আগের ওঁর পায়ের ধুলো সনাক্ত করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই মাথায় ঠেকিয়ে নিতাম। এত বছর পরেও আমরা আধুনিক পুলি, ওডোমিটার, মাটি থেকে পেঁচিয়ে জল তোলা অর্থাৎ আর্কিমিডিস স্ক্রু ব্যাবহার করে থাকি। ছোটোবেলায় একটা গল্প শুনে খুব মজা পেতাম – একবার এখানকার রাজা হিয়েরো নাকি স্যাকরাকে দিয়ে সোনার মুকুট বানিয়ে আর্কিমিডিসকে বলেছিলেন – এই মুকুটটা না ভেঙে কি বলতে পারবে স্যাকরা সোনার সঙ্গে আর কিছু মিশিয়ে আমায় ঠকিয়েছে কিনা? সেদিন আর্কিমিডিস্ বাড়িতে এসে যখন বাথটবে স্নান করতে নামলেন তখন দেখলেন কিছুটা জল বাইরে ছলকে পড়ল। উনি সেই অবস্থাতেই 'ইউরেকা ইউরেকা' অর্থাৎ পেয়েছি পেয়েছি বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রাজাকে গিয়ে বললেন – মুকুটকে একটা পাত্রে ডুবিয়ে কতখানি জল উছলে পড়ে সেটা মাপতে হবে আর ঠিক ততখানি ওজনের একতাল সোনা গামলায় ফেলে দেখতে হবে দুটো থেকে একই পরিমাণ জল উছলে পড়ে কিনা। যদি মুকুট খাঁটি সোনার হয় তাহলে দুবারই একই পরিমাণ জল বের হবে আর খাদ মেশানো থাকলে মুকুটটা আয়তনে একটু বড় হবে তাই বেশি জল ফেলে দেবে। আজ যা কিনা 'আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল' নামে খ্যাত।
যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন রোমানরা ভয়ে সাইরাকিউস আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। দুবার যুদ্ধ করতে এসে ধারে কাছে কোনও সৈন্য না দেখে রোমানরা ভেবেছিল তাদের ভয়েই বোধহয় ব্যাটারা পালিয়েছে, যদিও তারা বাস্তবে আর্কিমিডিস-এর নির্দেশই অনুসরণ করছিল। চারিদিকে উঁচু টিলাতে ঘেরা সমুদ্রের সাথে যুক্ত সেই কোটরটিতে একবার শত্রু জাহাজ ঢুকে পড়লে বাছাধনদের আর ঘুরে পালানোর রাস্তা থাকবে না। শোনা যায় আর্কিমিডিস নাকি তখন

থেকে নিচে জলের দিকে তাকিয়ে সত্যিই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। আয়না লাগানোর মোক্ষম জায়গা বটে। একবার এই কোটরে ঢুকে পড়লে অতগুলো জাহাজের পক্ষে ঘুরে সমুদ্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না কারণ সে যুগে ব্যাক গিয়ার ছিল না। একবার আর্কিমিডিস ক্রেনের সঙ্গে পেল্লাই বড় সাঁড়াশি জাতীয় কিছু লাগিয়ে শত্রুদের জাহাজগুলোকে উল্টে আছড়ে দিলেন যাকে আর্কিমিডিস ক্লু বা থাবা বলা হয়। এসব ভুতুড়ে কান্ডকারখানা দেখে রোমানদের ধারণা হয়ে গেল আর্কিমিডিস বেঁচে থাকতে তাদের পক্ষে সাইরাকিউস জয় করা সম্ভব নয়, তাই তারা নগরটিতে খাবার ও জল সরবরাহের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়। তিনবছর ধরে চলতে থাকা সেই অবরোধের পর খাবার ফুরিয়ে গেলে সাইরাকিউস যখন হার মানতে বাধ্য হল, রোমানরা পুরো নগরটিকেই লুট করে নিল। শোনা যায় রোমান জেনারেল মার্সেলস নাকি সৈন্যদের বারবার বলে দিয়েছিলেন তারা আর যাই করুক আর্কিমিডিস-এর যেন কোনও ক্ষতি না করে কারণ 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'। সৈন্যরা সেই অসাধারণ মানুষটিকে চিনতে না পেরে তরবারির এক আঘাতে তার মাথাটাই কেটে দিল। আর্কিমিডিস-এর সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম যদিও ভেতরে মুন্ডুবিহীন ধড়ের হাড়গোড়গুলো আদৌ আর্কিমিডিস-এর কিনা সে ব্যাপারে অনেকেরই সন্দেহ আছে (আমাদের দেশের কনিষ্ক অবশ্য বিনা মাথাতেই দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন)।

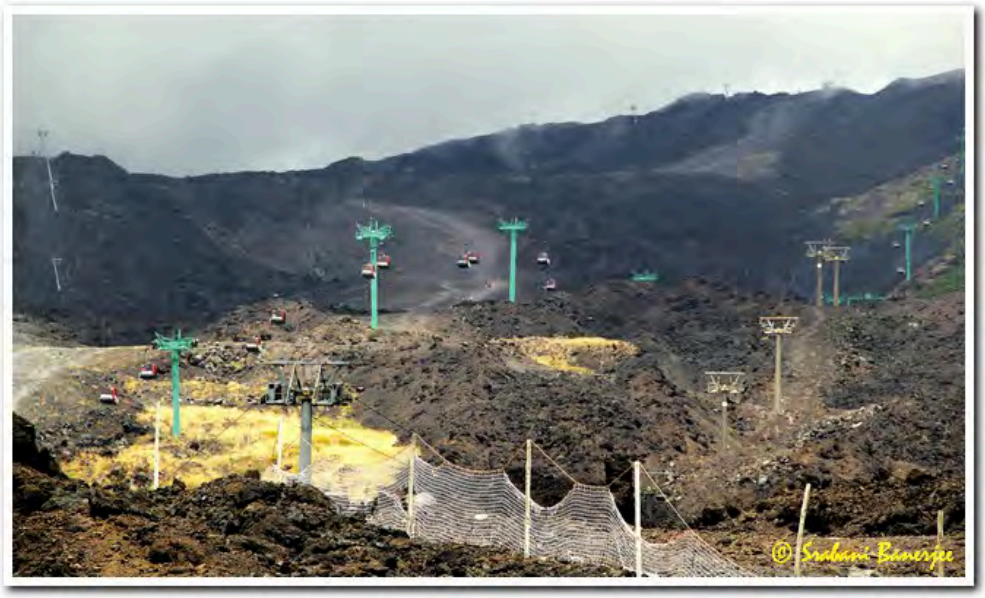

সিসিলিতে থাকাকালীন আমাদের শেষ কয়েকটা গন্তব্যস্থল ছিল মাউন্ট এটনা, টাওরমিনা আর সাভোকা। সিসিলি এতটাই ছোট যে এক-দেড় ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এক দ্রষ্টব্য স্থান থেকে আর একটিতে অতি অনায়াসে পৌছে যাওয়া যায় – কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্রতট আর কখনোবা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এগারো হাজার ফিট উঁচু আগ্নেয়গিরি মাউন্ট 'এটনা', গ্রিক নামটির ইংরেজি অর্থ 'I burn' - তার সামনে যাওয়ার জন্য প্রথমে কেবলকার নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম তারপর এক সাংঘাতিক মোটা চাকাওয়ালা বাস আমাদের একেবারে আগ্নেয়গিরির সামনেই নামিয়ে দিল।

দেওয়া সার্থক কারণ আজও তিনি একইভাবে জ্বলে যাচ্ছেন। দুহাজার সাল থেকে ধরলেও প্রায় গোটা পনেরো বিস্ফোরণ ঘটেছে আর সাড়ে তিনশো বছর আগে এখানে কুড়ি হাজার অসহায় মানুষ দম আটকে পুড়ে মারা যায়। এই অগ্ন্যুৎপাতের অবশ্য একটি ভালো দিকও আছে কারণ উর্বর জমিতে প্রচুর শাক সবজি আর আঙুর হয় তাই এখানকার ওয়াইনও খুব সুস্বাদু। পায়ে মোটা জুতো থাকা সত্ত্বেও মনে হল কেউ যেন পায়ের তলায় ছ্যাঁকা দিচ্ছে, কিঞ্চিৎ লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে চলতে ভাবলাম একেই বলে ভলকেনো – সাধে কী আর রোমানরা 'ভালকান' বা অগ্নি দেবতার পুজো করত!

এরপর সোয়া একঘন্টা গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেলাম সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর 'Pearl of Ionian Sea' টাওরমিনাতে। পাহাড়ের ওপর আর নিচে নীল সমুদ্র নিয়ে আমাদের হোটেলটাও ছিল বড় সুন্দর। চারিদিক দেখে মনে হল সাধে কী আর গ্রেটা গার্বো, কেরি গ্রান্ট, লিজ টেলর ও গ্রেগরি পেক-এর মতো সেলিব্রিটিরা বা গ্যেটে, ডুমা ও অস্কার ওয়াইল্ড-এর মত কবি সাহিত্যিকরা এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন!

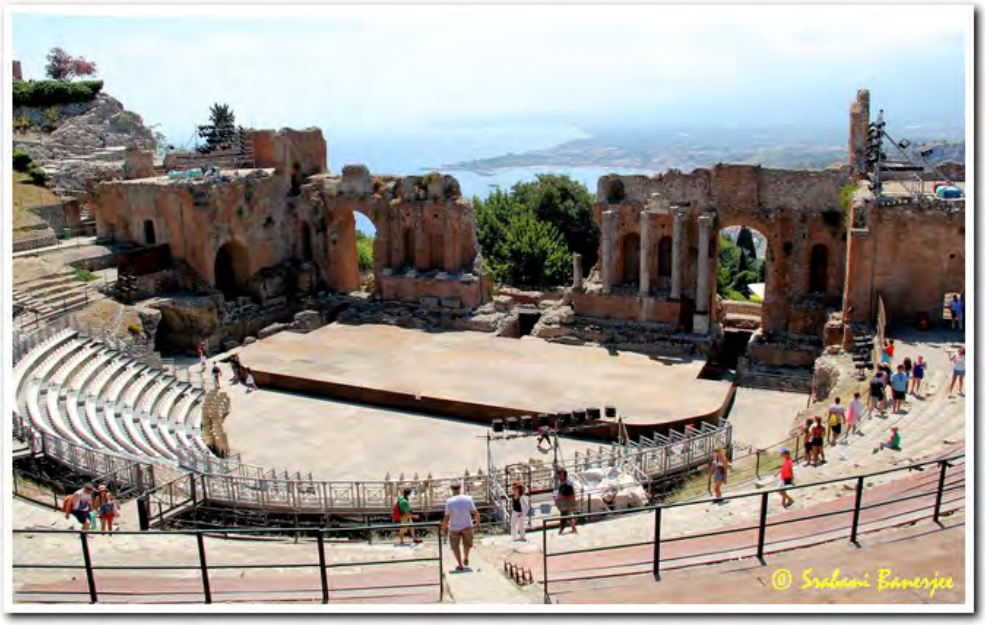

পাথরে বাঁধানো রাস্তা, ধারে ধারে সুন্দর সাজানো দোকান, ফুলে ঢাকা সব ভিলা, মধ্যযুগীয় চ্যাপেল, পেছনে আগ্নেয়গিরি আর নীল সমুদ্র নিয়ে এ যেন সত্যিই এক পিকচার পোস্টকার্ড। দুহাজার তিনশো বছরের পুরোনো গ্রিক থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম শেক্সপিয়র-এর 'রোমিও জুলিয়েট' চলছে অর্থাৎ এতবছর পরেও লোকসমাগমে তিনিও মাউন্ট এটনার মতনই জীবন্ত আর এখানে দাঁড়ালে দূরে মাউন্ট এটনার রূপটিও চোখে পড়বে। সমুদ্রে নেমে দেখলাম নুড়ি পাথরের ঠেলায় হাঁটে কার সাধ্যি। অগত্যা রাস্তা থেকে রবারের চটি কিনে একটু এগোতে না এগোতেই একটি বিশাল পাথরের গায়ে ধাক্কা খেলাম। নাহ! এ কোনও মিহি বালির সমুদ্রতট নয় যে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে ফুর্তিতে হাঁটবেন বরং এর সৌন্দর্য কিঞ্চিৎ দূর থেকে উপভোগ করাই ভালো।

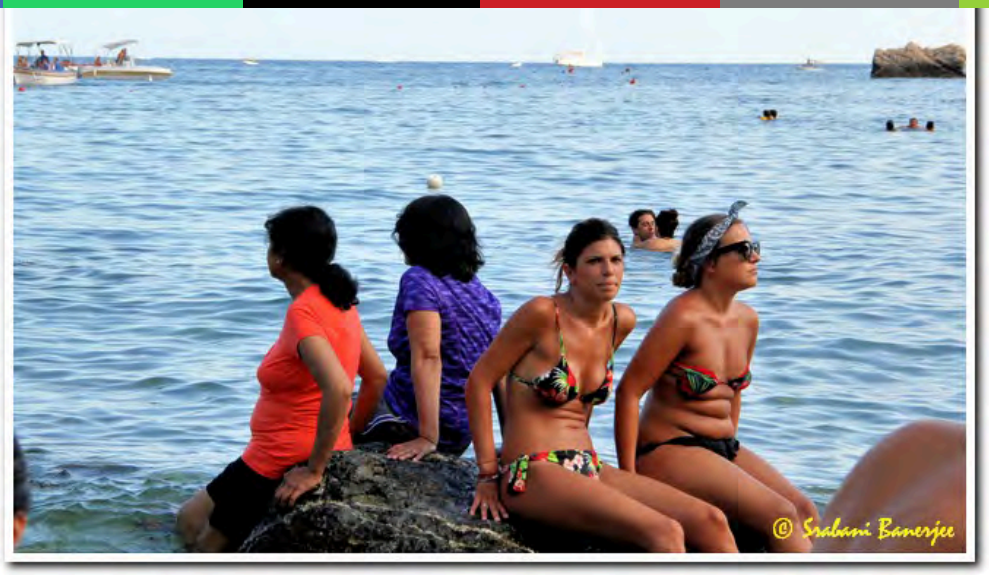

'গডফাদার' সিনেমাটি বহুবার দেখার ফলে উৎসাহিত হয়ে কাছেই সাভোকা জায়গাটি দেখতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ে ওঠার একটিমাত্র সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হল মাফিয়াদের নিয়ে শ্যুটিং করার এক আদর্শ জায়গা বটে।

চারিদিকে আঙুরের ক্ষেত, কমলালেবু আর অলিভের জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে 'বার ভিটেলি'টা দেখেই চোখের সামনে যেন 'গড ফাদার'-এর দৃশ্যটা ভেসে উঠল। ভেতরটা দেখলাম অতি পুরোনো সময়ের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো আর তার সঙ্গে দেয়াল জুড়ে টাঙানো আছে 'করলিয়নি' পরিবারের বংশতালিকা। সব চরিত্র কাল্পনিক হলেও শোনা যায় এরকম একটি পরিবার নাকি সত্যিই এ তল্লাটে ছিল। সনাক্ত করতে পারব না জেনেও চারিদিকটা একটু টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে নিলাম যদি একটাও – নাহ! তেনারা অত সহজলভ্য নন যে আমাদের মত হেঁজিপেঁজিদের দর্শন দিতে আসবেন, এখানে সবাই আমারই মতো ট্যুরিস্ট। অতএব মনের বিষণ্ণতা কাটাতে গোটা দুয়েক পেস্ট্রি আর কফির অর্ডার দিলাম। হঠাৎ সাংঘাতিক বাজনার শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখি গোটা দুয়েক সাদা পোশাক পরা বছর দশেকের মেয়েকে রীতিমতো উঁচুতে তুলে লোকজন নিয়ে আসছে। আন্দাজে বুঝলাম মেয়েগুলো সব এঞ্জেল আর সামনে গোটা দুয়েক শয়তান নেচে নেচে তাদেরকে বিগড়ে যাওয়ার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে। একেই বলে ফাটা কপাল, এখানে এসে মাফিয়াদের পরিবর্তে কিছুটা শয়তানদের নাচ দেখাই সার হল যদিও আমার কাছে দুটোর তফাৎ সামান্যই। এখান থেকে সেই ছবির মত সুন্দর টাওরমিনাতেই ফিরে গেলাম আর সেখানে দিনদুয়েক কাটিয়ে সিসিলিকে বিদায় জানলাম।

পাহাড়, সমুদ্র, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, আড়াই হাজার বছরের পুরোনো গ্রিক টেম্পল, ক্যাসেল, রোমান মোজাইক, মুসলমান কারিগরদের নির্মিত ক্যাথিড্রাল, নানা ধর্ম, নানা জাত ও নানাবিধ খাবারের সম্ভার নিয়ে এ যেন সত্যিই এক বড় সুন্দর বৈচিত্র্যময় দেশ। এক কথায় বলা যায় – এই বিবিধ মিশ্রণে গড়া সিসিলি বর্ষাকালের খিচুড়ি বা শীতের পাঁচমিশালি তরকারির মতনই উপভোগ্য যার স্বাদ একবার পেলে সহজে ভোলা যায় না।

শ্রাবণী ব্যানার্জির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইতিহাস পাঠ ও সঙ্গীত-চর্চাতে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত।

Comments

Name

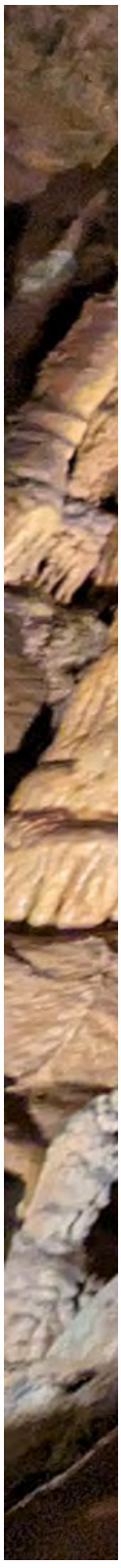

ল্যুরে ক্যাভার্নস

দীপান্বিতা গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর আগে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট ল্যুরে ক্যাভার্নস (Luray Caverns) আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৩ অগাস্ট, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। স্বভাববশত হিসেব করতে শুরু করলাম, আমরা ১২ অগাস্ট, ২০২৩ অর্থাৎ আবিষ্কারের ঠিক ১৪৫ বছরের মাথায় সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসে পড়েছি আমেরিকার পূর্ব প্রান্তের বিস্ময়কর এই গুহা দেখতে! বাবলিদি বার বার বলেছে, ভার্জিনিয়া গেলে এবার ল্যুরেতে যাস। যদিও অন্ধ্রপ্রদেশে আরাকু ভ্যালির কাছে বোরা কেভস্ তোদের দেখা।

বোরা কেভস্ যেন ল্যুরের ছোটো সংস্করণ। আবিষ্কারের সাল তারিখ বলছে, বোরা কেভস্ আবিষ্কৃত হয়েছিল, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ ভূতাত্ত্বিক উইলিয়াম কিং ছিলেন এর আবিষ্কারক। লক্ষ বছর আগে বয়ে যাওয়া নদীর জল চুনা পাথরের বিশাল দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢুকে মাটি, নানা খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে আশ্চর্য সব আকার নিয়েছে বোরা কেভসের ভেতর। স্থানীয় লোককথা বলে, এখানে রাম-লক্ষ্মণ নাকি বনবাস যাপন করেছিলেন। একটু পৌরাণিক ছোঁয়া আমাদের আরও উৎসাহিত করে। পর্যটকরা এর সন্ধান পান গত শতকের আটের দশকে। মনে আছে, প্রায় একশো কুড়িটা সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে নেমেছিলাম। একটা জায়গায় ছিল, দূরে মাথার ওপরে বেশ বিরাট গর্ত দিয়ে সূর্যের আলো সোজা গুহার ভেতর ঢুকছে। যেন হেসে বলছে, এবার তো ওপরে ওঠার পালা। ওঃ! সময় নিয়ে, থেমে থেমে, হাফাঁতে হাঁফাতে ওঠার কথা মনে হতেই কেমন দুমড়ে গেলাম। তা বেশ কয়েক বছর আগের দম আর এখনকার দম, ওরে বাবা! জিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে, বোরা কেভসের মতো নাকি, পারব?' মুচকি হাসি, 'চল না।' অভয় হাসি দেখলাম বলেই তো মনে হল।

গুহার বিরাট দরজার সামনে দাঁড়াতেই যেন অদৃশ্যে কেউ বলে উঠল, চিচিং ফাঁক! লাইন দিয়ে ঢুকে গেলাম গুহা পরিক্রমায়। দুরুদুরু চিত্তে গভীরে, আরও গভীরে যাচ্ছি, সুন্দর রাস্তা ধরে অবলীলাক্রমে যাচ্ছি শুধু আমরা নই সত্তর-আশি উর্ধ্ব যুবক যুবতীরাও। মাঝে মাঝে উত্তরণ, অবতরণ আছে বটে কিন্তু তাতে কারো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। পরিকল্পনামাফিক পথ কাটা। পথে দেখতে পাওয়ার মতো মাঝে মাঝে আলোও আছে। এদেশের এই দিকটা আমার খুব পছন্দের। যেকোনও কিছুতেই এরা অল্পবয়সীদের সঙ্গে বয়স্ক মানুষও যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার কথা চিন্তা করে। আর শিশুদের প্রাধান্য তো সবার আগে। যদিও ল্যুরে ক্যাভার্নস সরকারি নয়, গ্রেভস্ পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানায় সংরক্ষিত। এতক্ষণে মনে বেশ সাহস এসে গেছে। বুঝলাম, বাইরের গরম থেকে আমরা গুহার ভেতর ঠান্ডায় জুড়িয়ে যাচ্ছি। যত ভেতরে ঢুকছি আহ! ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল্ কুল্। আর মেজাজে খচাখচ্ ছবি তোলা শুরু।

গুহার বিরাট দরজার সামনে দাঁড়াতেই যেন অদৃশ্যে কেউ বলে উঠল, চিচিং ফাঁক! লাইন দিয়ে ঢুকে গেলাম গুহা পরিক্রমায়। দুরুদুরু চিত্তে গভীরে, আরও গভীরে যাচ্ছি, সুন্দর রাস্তা ধরে অবলীলাক্রমে যাচ্ছি শুধু আমরা নই সত্তর-আশি উর্ধ্ব যুবক যুবতীরাও। মাঝে মাঝে উত্তরণ, অবতরণ আছে বটে কিন্তু তাতে কারো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

পছন্দের। যেকোনও কিছুতেই এরা অল্পবয়সীদের সঙ্গে বয়স্ক মানুষও যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার কথা চিন্তা করে। আর শিশুদের প্রাধান্য তো সবার আগে। যদিও ল্যুরে ক্যাভার্নস সরকারি নয়, গ্রেভস্ পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানায় সংরক্ষিত। এতক্ষণে মনে বেশ সাহস এসে গেছে। বুঝলাম, বাইরের গরম থেকে আমরা গুহার ভেতর ঠান্ডায় জুড়িয়ে যাচ্ছি। যত ভেতরে ঢুকছি আহ! ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল্ কুল্। আর মেজাজে খচাখচ্ ছবি তোলা শুরু।

প্রায় ঘন্টাদেড়েক ধরে গুহা পরিক্রমা; শুধু আশ্চর্য হয়ে দেখছি, বিশ্বকর্মার নিপুণ হাতের কারিগরি! কখনও সাদা, কখনও লাল, কখনও লৌহকালো রঙের আপনাআপনি তৈরি এক একরকম আকৃতির চুনাপাথরের শিল্প। কোথাও মনে হচ্ছে যেন শাড়ির কুঁচি, কোথাও সারি সারি হাতির পাল, সারি সারি টাটকা লইট্যা মাছ, কোথাও গণেশ, কোথাও খোদাই করা গুহামানব তো কোথাও পদ্মকুঁড়ি! নিজের মতো করে ভেবে নিতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। একেবারে যাকে বলে 'ভাবনার শতদল'। এই মাথার ওপরে ঝুলছে তো এই ভুঁইফোঁড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিষ্ণু, ইন্দ্রনীল বলছে এই দেখো স্ট্যালাকটাইটস (stalactites) স্ট্যালাগমাইটস (stalagmites)। গুহার অনেকটা ভেতরের দিকে স্বচ্ছ জলের ওপর স্ট্যালাকটাইটস-এর প্রতিবিম্বে মনে হচ্ছে যেন আয়নায় নিজেদের মুখ দেখছে। আবার এক একটা স্ট্যালাগমাইট যেন ইয়া বড়া উইয়ের ঢিপি।

এগোতে এগোতে দেখি একটা বিরাট জায়গা জুড়ে অন্ধকার গুহার মাঝে অসংখ্য প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়েছে। একেবারে আমাদের দেওয়ালির আলোকসজ্জা। আবার খানিক এগোতে দেখি একটা জায়গায় জটলাপাকানো ভিড়। দেখলাম, গুহার গা চুঁইয়ে পড়া অদ্ভুত সবুজ জমা জল, লেখা আছে, Wishing Well। অনেকে মনস্কামনা করে ডলার, খুচরো সেন্ট ফেলছেন। বাহ্, আমরাও তো গঙ্গা বা যেকোনও পবিত্র স্থান পেলেই এমনই করি।

আচ্ছা,আমাদের বোরা কেভসের গল্পের মতো এই গুহার কোন গল্প নেই? হ্যাঁ, আবিষ্কারের গল্প আছে। নেটিভ আমেরিকানদের কাছ থেকে জানা যায়, একদিন কয়েকজন ইউরো-আমেরিকান সহ পাঁচজন স্থানীয় মানুষের চোখে পড়ল, চুনা পাথরের একটা পাহাড়ের খানিকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে আর সেখানকার একটা ছোট ফুটো দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বেরোচ্ছে। তাহলে কি এখানে গুহা আছে? শুরু হল অনুসন্ধান, সেই ফুটো কেটে বড় করার কাজ। চার ঘন্টা ধরে খোঁড়াখুঁড়ির পর ছোটখাট মানুষ ঢোকার মত গর্ত হতেই দলের সবচেয়ে বেঁটে দুজন গুঁড়ি মেরে ওই গর্তে ঢোকেন। সঙ্গে দড়ি ও মোমবাতি নিয়ে এগোতে এগোতে আবিষ্কার করলেন এই আশ্চর্য গুহা। সেইদিনটাই ছিল ১৩ অগাস্ট ১৮৭৮। ভিজে ভিজে, ঠান্ডা ঠান্ডা, উঁচু নিচু পথে আওড়াতে আওড়াতে যাচ্ছি স্ট্যালাকটাইটস স্ট্যালাগমাইটস। এই যাঃ, ভুলে

স্ট্যালাগমাইটস-এর 'জি'-তে গ্রাউন্ড।' একগাল হেসে ছেলে বলল, 'এবার আর ভুল হবে না বলো?'

গুহা পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে আর এক চমক! আমেরিকান গাইডের ইংরেজি বোঝা কী মুশকিল! ছেলেদের শরণাপন্ন হওয়াই ভালো। এই মুহূর্তে যেখানটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে গিনেস বুকে স্থান করে নেওয়া ৩.৫ একর জুড়ে দ্য গ্রেট স্ট্যালাকপাইপ অরগান (The great stalacpipe organ) রয়েছে। মি. লেল্যান্ড ডব্লিউ. স্প্রিঙ্কলার ১৯৫৪ সালে এখানে লিথোফোন (lithophone)-এর সন্ধান পেয়েছিলেন । তিনি ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ এবং ইলেকট্রনিক্স সায়েন্টিস্ট। গুহার ভেতরে গাইডের ডেমনস্ট্রেশন দেখে তিনি চমকে ওঠেন। গাইড একটি চুনাপাথরের ওপর ম্যালেট (রবার আর কাঠের তৈরি ছোট হাতুড়ি) দিয়ে আলতো আঘাত করতেই সুন্দর মিষ্টি সুর সৃষ্টি হচ্ছে।

মি. স্প্রিঙ্কল ওই বিশাল গুহার চেম্বারে বিশেষ বিশেষ স্ট্যালাকটাইটস নির্বাচন করে তিন বছরের চেষ্টায় কয়েকটি টিউন সেট করলেন। এক একটি ইলেক্ট্রিক্যাল ম্যালেট দিয়ে ছোট্ট করে ঠুক ঠুক করে ভিন্ন ভিন্ন পাথরের মধ্যে বিভিন্ন রকম সুরেলা আওয়াজ শুনতে পেলেন। এই সুরের অনুরণন আমাদের শোনার উপযুক্ত করে তৈরি করলেন অর্গানের সুর। আমরা সেই লিথোফোনের অর্গান-এর সুর শুনলাম। সারা এলাকা জুড়ে অর্গানের মৃদু সুর গুহার অন্ধকার ভেদ করে মনের গহনে যে অনুরণন তুলল তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। প্রকৃতির এই আশ্চর্য সৃষ্টির রহস্য ভাবছি – বাইরের বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইডের সংস্পর্শে এসে গুহার ভেতরের জল মাটির সঙ্গে মিশে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে। আর সেই মিশ্রণ মাটির ভেতরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে চুনাপাথরের পরতে পরতে গিয়ে এমন নানা আকার তৈরি করছে। আবার সেই পাথরেই সুরের সঞ্চার হচ্ছে!

'কঠিন লোহা কঠিন বুকে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইল কে?
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন, ওগো, তায় জাগাইনু রে।'

সাধে কী আর বিশ্বকবি! নিজের অজান্তেই মি. স্প্রিঙ্কল-এর জন্যও গান লিখে গেছেন।

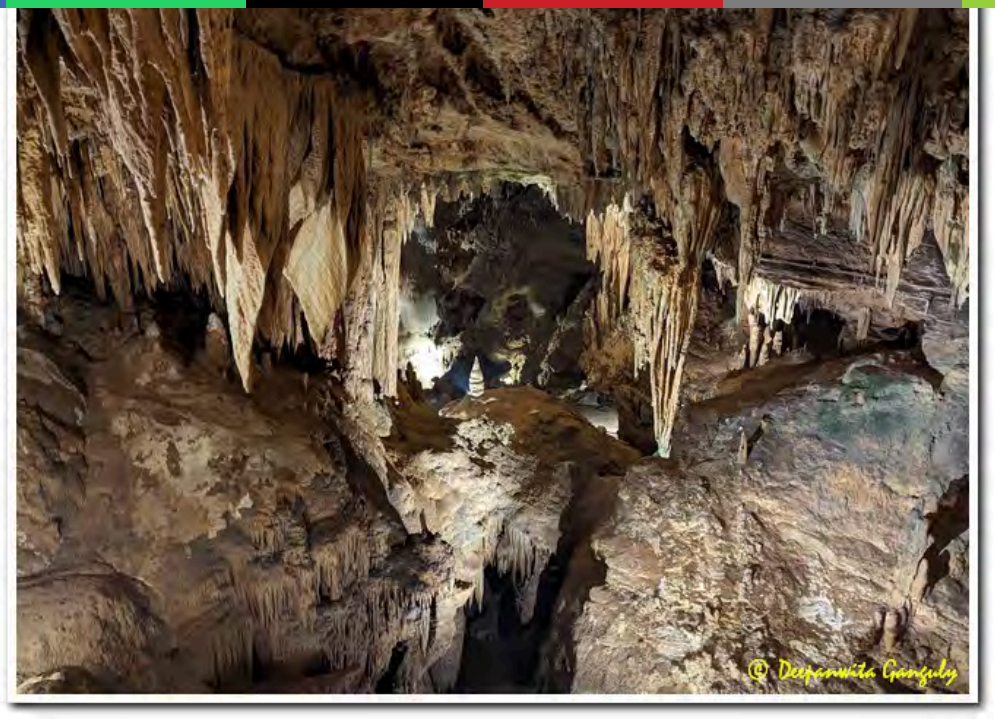

দীপান্বিতা গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গীতপ্রেমিক ও ভ্রমণপিপাসু। বিভিন্ন স্মারক সংকলনে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

সফর কমব্রিজ

সঞ্চারী দাশগুপ্ত

কেমব্রিজের মতন স্বনামধন্য একটি স্থানের স্বচক্ষে দেখতে পেরেছি ভাবলেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে যায়। শুরু থেকে শুরু করা যাক।

লন্ডনের লিভারপুল স্টেশন থেকে ঝাঁ চকচকে, উন্নত প্রযুক্তির, সুসজ্জিত ট্রেনে চেপে রওনা দিলাম কেমব্রিজ-এর উদ্দেশ্যে। ট্রেনের দীর্ঘকায় জানলা দিয়ে নীল অসীম আকাশের ছাউনির নিচে মাইল-এর পর মাইল বিস্তৃত মনোরম সবুজ মাঠ ঘাট দেখতে দেখতে যেতে বড্ড আরাম হচ্ছিল। আরও অভিভূত হলাম যখন হলুদ সরষে ক্ষেত অনেকখানি সফর জুড়ে বিনোদন জোগাল। মনটা সতেজ ও ফুরফুরে হয়ে গেল যেন। দেশের কথাও ঝিলিক মারছিল মনের মধ্যে বারবার। নানা কথায় ডুবে আছে মন, তখনই জানা গেল গন্তব্যস্থল ইতিমধ্যে হাজির।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলাম শহরটাতে ছিমছাম গোছগাছ করা একটি পরিপাটি ব্যাপার রয়েছে যেটি প্রথমেই বেশ মন কাড়ল। আমি একটু পিটপিটে স্বভাবের কিনা। তা যা হোক, একটি বাস ধরে সোজা সিটি সেন্টার রওনা দিলাম। বাস থেকে নেমে বুঝলাম সিটি সেন্টার নামটি যথাযত মর্যাদাই পেয়েছে এখানে। বেশ প্রাণবন্ত, এমনকি ক্যাকোফোনাসও বলা চলে। হঠাৎ করে পর্যটকদের এত ভিড় ও অনর্গল কিচিরমিচিরে খানিক থতমতই খেলাম। আবারও হতবাক হলাম যখন দেখলাম রাস্তার ধারে স্টল দিয়েছে কিছু হিন্দু ধর্মের প্রচারক এবং তারা সমানে হরে কৃষ্ণ গান করে চলেছে, সঙ্গে বিনামূল্যে গীতা বিতরণীও চলছে। তার পরে পরেই হদিস মিলল একটি মেলা প্রাঙ্গণের, যেখানে হরেক রকমের টফি ও ফাস্টফুড স্টল স্বভাবতই আমার কেমব্রিজ ভ্রমণের পিপাসাকে মুহূর্তের জন্য হলেও খানিক ছাপিয়ে গেল। কিছুটা ডাইভার্ট হয়েই রসনাতৃপ্তি সেরে ফেললাম। এত ধর্মের, এত জাতের মানুষের মিলনের সাক্ষী হব এখানে এসে, তা উপলব্ধি করে বেশ একটা পরিতৃপ্তিও হল।

এরপর আর সময় নষ্ট না করে মনোনিবেশ করলাম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাস তো নয়, যেন এক আস্ত শহর! কতো সুদৃশ্য, আকর্ষণীয় দোকানপাট! বুঝতে একটু অসুবিধাই হচ্ছিল, এখানে কি আদৌ কোনও কলেজ থাকা সম্ভব? এমন ভাবামাত্রই দেখলাম স্বয়ং কিং'স কলেজ, বেশ অট্টালিকামাফিক আকৃতি নিয়ে, মাথা উঁচিয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুঠোফোনে মুহূর্ত বন্দী করতে বিন্দুমাত্র দেরি করলাম না।

এরপর যতই এগোতে থাকলাম রাস্তা ধরে, একের পর এক বিশ্ববিখ্যাত কলেজ ট্রিনিটি, সেন্ট জনস্-এর মতো আরও অনেক প্রতিষ্ঠানই ঝাঁকে ঝাঁকে উঁকি দিতে লাগল। গঠনের ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, এদের দম্ভ আজও বিশেষ ক্ষীণ হয় নি। শত শত বছরের বেশি পুরোনো এই সব ইমারত আজও কেমন দোর্দণ্ডপ্রতাপে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রয়ে গেছে ভাবলেই বিস্ময় জাগে! কতো মজবুত এদের ভিত! কতো প্রবাদপ্রতিম মানুষের পা পড়েছে এই সব কলেজে, এই সব রাস্তায়, ভাবলেই মেরুদন্ড শক্ত হয়ে যায়।

শুনেছি শুধুমাত্র শিক্ষার গুণগত মানের পরিপ্রেক্ষিত এই নয়, আর্কিটেকচারের দিক থেকেও নাকি কেমব্রিজ অন্যতম একটি শহর। বাদামি রঙের, অধিকাংশই গথিক স্টাইলে নির্মিত স্থাপত্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও, খতিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায়, একে অন্যের থেকে খানিক আলাদাও বটে; বিশেষত তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে চলতে, প্রাচীন শহরটার অলিগলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে বেশ একটা ইউরোপিয়ান আমেজ বোধ করছিলাম।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলাম যখন ট্রিনিটি কলেজ প্রাঙ্গণের সামনে জটলা পাকিয়ে কয়েকজন পর্যটককে বিশেষ একটা কিছুর ওপর ক্যামেরা ফোকাস করতে দেখলাম। কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, সমস্ত উত্তেজনার মূলে স্যার আইজাক নিউটন-এর সেই বিখ্যাত অ্যাপল ট্রি। ভেবেই রোমাঞ্চিত হলাম যে আমিও আজ সেই বিস্ময়কর ঐতিহাসিক আবিষ্কারের সাক্ষী হলাম তবে! সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি নিউটন-এর এই আপেল গাছ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার-এর ঘটনা। সেই গাছ চাক্ষুষ করে বড়ই প্রাপ্তি বোধ হচ্ছিল। যদিও পরমুহূর্তেই এক সত্য উন্মোচিত হয়ে আমার সমস্ত উৎসাহে জল ঢেলে দিল, যখন জানতে পারলাম এই ট্রি-টি শুধুমাত্রই একটি মডেল, প্রকৃত গাছটির অনুকরণে নির্মিত মাত্র।

আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে সরে পরলাম ট্রিনিটির সামনে থেকে। এরপর একের পর এক কলেজ অতিক্রম করে ক্রমশ এগিয়ে চললাম এই চত্বরের পাশ দিয়ে বহমান ক্যাম নদী দর্শনে। খুব ইচ্ছে ছিল রিভার-পান্টিং অর্থাৎ ক্যাম নদীর ওপর দিয়ে বোটিং করার ও দুপাশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার। সাথে ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ কলেজগুলির দেখা পাওয়া তো উপরি পাওনা বটেই, তবে তা আর সম্ভব হল কই? কনকনে, ঝোড়ো হাওয়া বাধ সাধল যে প্রতিবারের মতোই। বোট

চেপে নদীবক্ষে পরিভ্রমণের দুঃসাহস আর দেখালাম না। অগত্যা, খানিক হতাশ হয়েই বিপরীতমুখী হয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম। রাতও হয়ে আসছিল বেশ। সফরটা যেন 'শেষ হয়েও হইলো না শেষ' হয়েই সমাপ্ত হল। তবে সেদিন প্রাপ্তির ঝুলিতে হরেকরকম ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতাই জড়ো হল। এই মুহূর্তগুলোই তো সারা জীবনের পথ চলার পাথেয় হয়ে রয়ে যাবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সঞ্চারী দাশগুপ্ত বর্তমানে ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ফ্রিল্যান্স লেখালেখি করেন, ঘুরেবেড়াতে ভালবাসেন।

Comments

Name

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

বেথুয়াডহরিতে একদিন

পথিক

২৬ জুন, ২০২৩

প্রবল গরমে নাকানিচোবানি খেতে খেতে ঝুম বৃষ্টিতে ভেজার কথা মনে হত।
এই মাসের প্রথমে গরম কমার বিন্দুমাত্র লক্ষণ না দেখে কিছুটা ব্যাজার মুখেই বেথুয়াডহরিতে জায়গা বুক করি।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। চা-পর্ব শেষ করে চলে এলাম এখানকার রিজার্ভ ফরেস্টে। দু-পা এগোতেই নামল বৃষ্টি। একদৌড়ে উঠলাম বনদপ্তরের একটা ছোট্ট অফিসের বারান্দায়। অফিসে কেউ নেই। ভিতর থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে বারান্দায় আরাম করে বসলাম। ঘন জঙ্গলের ওপর বৃষ্টি দেখতে ভালই লাগছিল। একটু বাদে বৃষ্টি কমলে দুজন এল। বলল, আরেকটু বসে যেতে। গাছের থেকে বৃষ্টির জলটা খানিক ঝরে যাক।

সেখানে চারমূর্তি বসে আছেন। তাঁদের তিনজনই সবুজবর্ণ। আরেকজন অবশ্য সবুজের ওপরে অনেকখানি হলুদ। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই ইষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, কঃ। অর্থাৎ আমার কুশল জানতে চাইছেন। বললাম, ভালো। শুনে ঘাড়খানা উল্টোদিকে বাঁকিয়ে বললেন, কঃ। এবারে হয়তো আমি কে সেটাও জেনে নিতে চাইছেন। এই মেঘলা দিনে এমন একটা গভীর দার্শনিক প্রশ্ন শুনে বিচলিত হয়ে উঠতেই পাশ থেকে ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজ এল। দেখি দুটি অপেক্ষাকৃত ছোটো সবুজ পাখি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে কী যেন আলোচনা করছে। আমাকে দেখেই এমন ভাব করল যেন – আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই। আমি তাদের আলোচনায় নাক গলাতে চাইলাম না। পাখির খাঁচার উল্টোদিকে আরেকটা বড়ো ঘেরা জায়গায় একটা নীলগাই উদাস ভাবে পদচারণা করছিলেন; সেদিকে ফিরলাম। 'নীলগাইটার রং কেন কালো ঠেকছে' – এই গভীর তত্ত্বকথা ভাবতে যেতেই কেমন মনে হল কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ফের পাখির জায়গাটার দিকে ঘুরতেই দেখলাম একটা ময়ূর তার বিরাট পেখম বন্ধ করে রেখে একটা কৌতুকপূর্ণ চোখে দেখছে আমায়। ভাবখানা – এ ব্যাটা আবার কে? কোত্থেকেইবা এল? এমনসময় আবার বৃষ্টি নামল। ঝুম বৃষ্টি। ইচ্ছে হয়েছিল ময়ূরবাবাজির সঙ্গে একটা সেলফি তুলব তা এই বৃষ্টিতে জামা-কাপড়, চশমা সব ভিজে একশেষ। তাই সেলফির চেষ্টা না করে বৃষ্টির মধ্যেই এগোলাম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে চলার পথ ধরে।

২৭ জুন

গতকাল একজনের মুখে শুনেছিলাম পাটুলি-গঙ্গা ঘাটের কথা। জায়গাটা বেথুয়াডহরি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার। বছর দশেক আগেও ছিল প্রায় ১৫ কিলোমিটার। প্রতি বর্ষায় গঙ্গা ভাঙতে ভাঙতে এখন দূরত্ব কমে এসেছে।

সে যাই হোক, আজ সকাল নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। সামনের চায়ের দোকানদারের বদান্যতায় একটা অটো মিলে গেল যে নিয়ে যাবে, ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করবে আর তারপর ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। গতকাল থেকেই আকাশ কালো হয়ে আছে। পথে বাজার থেকে একটা ছাতা নিয়ে নিলাম। মিনিট চল্লিশ বাদে অটো পৌঁছে গেল পাটুলির ঘাটে। এদিকে নদী বেশ নিচে। বালির বস্তা দিয়ে নদীর ধারটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে - ভাঙন আটকানোর প্রয়াস। তবে এতে কি নদীর ভাঙন আটকানো যায়?

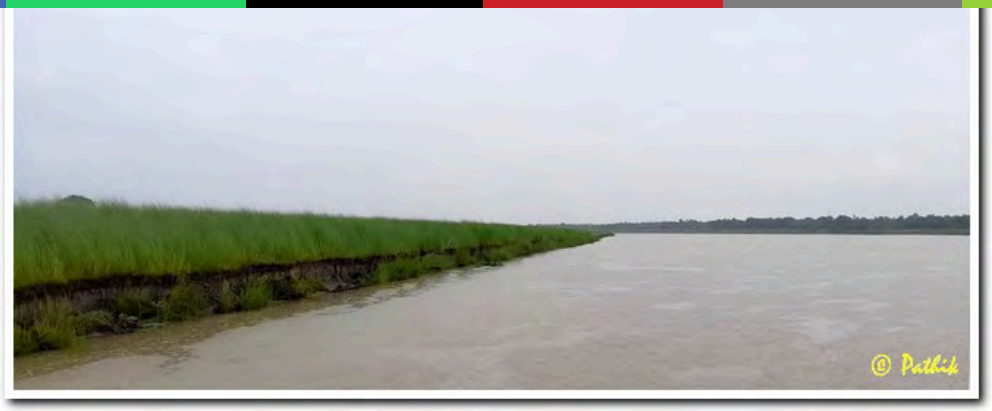

এখানে গঙ্গা বেশ চওড়া। ওপারে বিস্তীর্ণ চর। উঁচু ঘাসে ঢাকা। দেখলাম একটা নৌকা ওপারে যাবে। সামনে দিয়ে একটা মোটরবাইক দিব্যি তাতে উঠল। আরও কয়েকটি ছেলে-বুড়ো। বাচ্চা কোলে একজন বউ। মাঝিকে বললাম ও পারে যাব আবার ফেরত আসব, কত দেব? সে বেশ উদাস ভাবে বলল আসুন, যা হয় একটা দেবেন। গুটিগুটি নৌকায় চেপে বসলাম। নৌকা একটু পরেই ছাড়ল। নদীটা অনেকখানি পার করে ওপার ঘেঁসে যেতে লাগল। ওপারের কাছে যেতেই কতগুলো জোয়ান ছেলে ঝুপ-ঝুপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল। আমি বেশ অবাকই হলাম কান্ড দেখে। নৌকাতে বাকিরা নিরুত্তাপ। বুঝলাম এমন ঘটনা এখানে হামেশাই হয়ে থাকে। যেতে যেতে বৃষ্টি নামল, জোরে নয় যদিও। ভিজতে বেশ ভালই লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল খানিক আগেই ছাতা কিনেছি। হারিয়ে যাওয়ার আগেই সেটা ব্যবহার করা দরকার। অতএব ছাতা মাথায় নৌকা ভ্রমণ। ধীরে ধীরে নৌকা এগোচ্ছে। পাশের লোকটির সঙ্গে আলাপ জমালাম।
আপনার নাম কী?
সনাতন।
বাড়ি?
ওই পারে, পাটুলি বাজারে।
আচ্ছা, পাটুলির ঘাট এই পারে আর বাজারটা ওপারে কেন?
আগে গঙ্গা আরও দূরে ছিল, পাটুলি বাজার পেরিয়ে। বুঝলাম, নদী ভাঙতে ভাঙতে এদিকে চলে এসেছে। তাই পাটুলির ঘাটখানা এপারে কিন্তু বাজার আবার গড়ে উঠেছে পুরোনো জায়গাতে, চরের ওপরে।
এইযে, একটু আগে, ছেলেগুলো নদীর ধারে লাফিয়ে পড়ল কেন?
চরার জল-কাদায় মাছ ধরবে ওরা।
কী মাছ?
ছোটো ছোটো কত মাছ। যা পাওয়া যায়।

স্রোতের টানে নৌকা দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে ওই পাড়ে একটা ছোট্ট ঘাটে এসে দাঁড়াল। একটি বউ বাসন ধুচ্ছে। একবার এদিকে তাকিয়ে দেখেই আবার কাজে মন দিল। ঘাটের থেকে একটা কর্দমাক্ত হাঁটাপথ চলে গেছে। নিশ্চয়ই বাজারের দিকে। মাঝি নৌকোটা পাড়ের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মোটরবাইকটা ঠেলে নৌকা থেকে নামিয়ে কাদাপথটা পার করে দিল। বাকি কয়েকজনও একটু একটু করে নৌকা থেকে নেমে কাদাপথ পেরিয়ে হাঁটা দিল। আমি ছাতা মাথায় নৌকাতে দাঁড়ালাম। দুপাশের সবুজ চিরে নদী আরও নিচে নেমে হুগলীতে ঢুকেছে, তারপর কলকাতা। খুব দূরে না কিন্তু কত আলাদা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ফিরলাম। ফেরার পথে আবার কয়েকটি ছেলে কোমর-জল থেকে নৌকাতে উঠল। এরা সেই ছেলেগুলো না। তাদের মুখে বিশ্বজয়ের হাসি। কোমরে গামছায় বাঁধা মাছ। নিজেদের মধ্যে বকবক করে যাচ্ছে। এ ওকে নিজের রোজগার দেখাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখলাম অনেকগুলো বেলে মাছ আর ছোটো ছোটো কী কী সব মাছ। অনেকক্ষণ কোমর পর্যন্ত জলে দাপাদাপি করে ওই ক'টা ছোটো মাছ জুটেছে!

মানুষ কত অল্পতে আনন্দ পেতে পারে, কত অল্পতে তৃপ্ত থাকতে পারে! এইসব ভাবতে ভাবতে নৌকাটা কেঁপে উঠল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম পাটুলির ঘাটে এসে নৌকাটা ঠেকেছে।

পথিক ভালোবাসেন উদ্দেশ্যহীন বেড়াতে, গান শুনতে আর গাইতে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher